আসমানি আদালত
লাবীব আব্দুল্লাহ

নবপ্রকাশ

শুধু বই নয়...

www.pathagar.com

আসমানি আদালত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসমানি আদালত

মাহমুদ শিত খাত্তাব

লাবীব আব্দুল্লাহ
[অনূদিত]

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...

ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

www.pathagar.com

আসমানি আদালত

মূল : মাহমুদ শিত খাত্তাব
অনুবাদ : লাবীব আব্দুল্লাহ
প্রকাশক : নবপ্রকাশ
স্বত্ব : প্রকাশনা কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬ ঈসায়ি
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৭ ঈসায়ি
প্রচ্ছদ : কারুকাজ

নবপ্রকাশ

ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং: ২০] ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩, ০১৬৭৭ ০৫২৬৮০

মূল্য : ১২০ [একশত বিশ] টাকা মাত্র
Price : 120.00 BDT | US$ 4.00 only

ASMANI ADALOT
by Labib Abdullah
noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
e-store: rokomari.com/noboprokash
ISBN: 978-984-92654-4-3

www.pathagar.com

নুরে চশম, আমার আত্মজ ও আত্মজা–
লাবীবা মুসাররাত
নাবীলা নুসরাত
আবরার আব্দুল্লাহ
মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ

সকলের ইলমি ও দাওয়াতি জীবন কামনা করি,
একজন হলেও লেখক হবে– এই প্রত্যাশা...

www.pathagar.com

[মাহমুদ শিত খাত্তাব]

জন্ম : ঈসায়ি ১৯১৯, মৃত্যু : ঈসায়ি ১৯৯৮

লেখক মাহমুদ শিত খাত্তাব-এর জন্ম ইরাকের মুসেল শহরে। পেশাগতজীবনে তিনি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন–ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। যায়নবাদবিরোধী লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

সামরিক কর্মকর্তা হলেও তিনি প্রায় শতাধিক বইয়ের লেখক। ইসলাম ও আরবি ধ্রুপদী সাহিত্য নিয়ে তিনি প্রচুর লেখালেখি করেছেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামরিক জীবন নিয়ে তিনি একাধিক বই লিখেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার বইগুলো।

আদালাতুস সামা বইটিও অনূদিত হয়েছে তুর্কি, উর্দু ও ইংরেজিসহ অনেক ভাষায়। এ বইটির গল্পগুলো রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় পত্রপত্রিকায়। মসজিদের খতিব ও বক্তাদের কাছে বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত। কেননা বইটির প্রতিটি গল্প বাস্তবজীবনকে উপজীব্য করে লেখা।

আদালাতুস সামা গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। এরপর এর একাধিক সংস্করণ বের হয়েছে। বর্তমানেও ইরাক, বৈরুত ও আরবে বইটি বিপুল জনপ্রিয়।

লেখক মাহমুদ শিত খাত্তাব সেনাবাহিনীতে তার কর্মজীবন শেষ করে অবসরে লেখালেখি করে সময় কাটান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লেখালেখিই ছিলো তার জীবনের একমাত্র অন্বেষা।

মাহমুদ শিত খাত্তাব ১৯৯৮ সালে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

অনুবাদকের আর্জি

আদালাতুস সামা একটি আরবি ছোটগল্প সংকলন। মূল লেখক মাহমুদ শিত খাত্তাব। তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। লেখক শিত খাত্তাব *আদালাতুস সামা* বইয়ে নিজের জীবনে দেখা বাস্তব কাহিনীগুলো গল্পে রূপায়ণ করেছেন সাবলীল ভাষায়। নাটকীয়তা আছে গল্পে। কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। পরে কী হবে–গল্পপাঠ শেষ না করলে তা বলা মুশকিল। এমনই স্বাদু করে লিখেছেন তিনি প্রতিটি গল্প।

এগারোটি গল্প নিয়ে বইটি। প্রতিটি গল্প জীবনঘনিষ্ঠ। বাস্তবতাকে উপজীব্য করে তিনি গল্পের আঙ্গিকে লিখেছেন নিজের অভিজ্ঞতা। আমাদের চলমান জীবনে হর-হামেশা ঘটে এসব গল্প। পড়ে মনে হবে–

গল্পগুলো গল্প নয় জীবন। জীবনের গল্প। শিক্ষণীয়। দৃষ্টান্তমূলক।

এ গল্পগুলো জীবন বিনির্মাণ করবে, বিধ্বস্ত নয়।

গল্পগুলো ঈমান জাগানিয়া এবং শিক্ষণীয়।

গল্পগুলো সাদামাটা ভাষায় জটিল দর্শনের চিত্রায়ন।

কিছুটা রোমাঞ্চকর। তবে ছোটগল্পের সব শৈল্পিকগুণের অভাব অনুভব হবে না আশা করি। আমাদের জীবনে দেখা বা ঘটে যাওয়া গল্পের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে বাস্তবধর্মী এ গল্পগুলোতে।

www.pathagar.com

ইংরেজি, তুর্কি, উর্দু, ফার্সি ভাষাসহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। গল্পগুলো ইরাকের পত্রপত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।

আমার প্রিয় তামীম রায়হান। তার কথা না বললে চলবে না। তিনি একাধিক সফল বইয়ের লেখক। সংবাদপত্রে লেখালেখির মাধ্যমে পরিচয়। তিনি ভালো গদ্যশৈলীতে লিখেন। মাসিক নবধ্বনির স্বপ্নের কারিগর। নবপ্রকাশ প্রকাশনীর চেয়ারম্যান। আরবি ভাষায় দক্ষ লেখক।

ভিন্নধারা সৃষ্টির প্রয়াসী তামীম রায়হান বইটি অনুবাদের কথা বলেন। আরবির প্রতি আমার দুর্বলতা থেকে দুর্বল হাত নিয়ে শুরু করি অনুবাদ।

দেড় মাসে কাজটি শেষ হয়। আরবিতে টুকটাক অনুবাদ করলেও এজাতীয় গল্পের অনুবাদ প্রথম করলাম। ভাষা ও আঙ্গিকের দুর্বলতা স্বীকার করছি। তবে শক্তিমান হাত সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর সম্পাদনা করে দুর্বলকে শক্তিমান করেছেন। তিনি গল্পের মিস্ত্রি। গল্পের কলকব্জা ভালো জানেন।

তামীম রায়হান ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ২০০৭ সালের পর নতুনভাবে বই লেখায় বা অনুবাদ করায় উৎসাহ দিয়ে মাঠে নামালেন। আমার লেখালেখির আগ্রহ ফিরে পেলাম তামীম ভাইয়ের তাকিদে। অন্যথা 'ফেসবুকলেখক' বলতে যা বলা হয়, আমি ঠিক তাই।

আমার বইটি প্রকাশ হচ্ছে–এ জন্য নয়, তামীম রায়হানকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ কিছু উপহার দেবেন। তিনি কাতারপ্রবাসী। লেখক ও সংবাদকর্মী এবং তিনি ভালো পাঠক। আমার এ আশাবাদ আশা করি বিফলে যাবে না।

বইটির অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার প্রিয় মাহমুদুল হাসান জুনাইদের সহযোগিতা নিয়েছি। সে প্রতিভাবান আরবিপ্রেমী। ওয়ালিউল ইসলাম, সাজ্জাদ শরীফ, নোমান গল্পগুলো কম্পোজ, ই-মেইল করার কাজটি করেছেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভালোবাসার ফুল। দোআ।

www.pathagar.com

বিচার করবে পাঠক বইটি কেমন হলো। পাঠক বিরক্ত না হলে এ জাতীয় আরও কিছু বই প্রকাশ করতে আমরা আগ্রহী। নবপ্রকাশও আগ্রহী বলেই আমার বিশ্বাস।

বইপাঠে আমাদের সবারই আরও বেশি সময় দেয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে বই কেনার অভ্যাসও গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ভালো বই ভালো অভিভাবক।

লাবীব আব্দুল্লাহ
শিকড় সাহিত্য মাহফিল
গলগণ্ডা, ময়মনসিংহ

www.pathagar.com

কৈফিয়ত

লাবীব ভাই যেদিন থেকে *আসমানি আদালত* অনুবাদ শুরু করেন, সেদিন থেকে আমার মাথায় একটা লাইন ঘুরঘুর করছে। ইচ্ছা ছিলো, যদি বইটি আমি সম্পাদনার সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই এ লাইনটা লিখবো। লাইনটা এরকম– লাবীব ভাইয়ের লেখার নিজস্ব একটা স্টাইল আছে!

এ কথা প্রমাণিত সত্য। লাবীব ভাই নিজের জন্য তৈরি করা একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে লিখেন। সে প্রকাশভঙ্গির বিশেষত্ব হচ্ছে– ছোট ছোট বাক্য, কখনো এক শব্দ। বাক্য শেষ হলেও মনে হয়, কিছু কথা সম্ভবত বাকি রয়ে গেলো। কিন্তু বাক্যের ভাবপ্রকাশ ষোলোআনা উসুল। পাঠককে মোটেও পেছন ফিরে তাকাতে হয় না।

তামীম ভাই এটাকে 'মেসবাহীয়' প্রভাব মনে করেন। হতে পারে।

আমি যদিও গল্পগুলো পড়েছি কিন্তু সম্পাদনা যাকে বলে, সেটা মোটেও করিনি। আসলে আমাকে করতেই হয়নি। যতোটুকু না করলে প্রকাশনাপুরুস্ত হয় না, ঠিক ততোটুকুই। বাকিটা লাবীবীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে দিয়েছি। লাবীব ভাই নিজের সজ্জায় সজ্জিত হোন। তাকে ময়ূরপুচ্ছ পরানোর মতো ধৃষ্টতা না দেখানোই শ্রেয়।

আদালতুস সামা থেকে *আসমানি আদালত*। গল্পগুলো নিয়ে আমার এককথার অভিমত– প্রতিটি গল্প শিক্ষণীয়। গল্পের মধ্যে অযথা বাক্যালাপ নেই। অনর্থক শব্দের বাহুল্য নেই। প্রাঞ্জল ও গতিময় গদ্যে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে ইরাকের নাম না জানা কোনো শহরে।

www.pathagar.com

নবপ্রকাশ এ ধরনের শিক্ষণীয় ও সমাজহিতৈষী গল্প ভবিষ্যতে আরও প্রকাশ করবে। পশ্চিমাদের কুরুচিপূর্ণ ও যৌনতাসর্বস্ব গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের তরুণ বয়সী পাঠকদের মস্তিষ্কে যে বিকৃতি প্রবেশ করানো হচ্ছে, এর প্রভাব পড়ছে আমাদের পুরো তরুণসমাজের ওপর। এতে করে নষ্ট হচ্ছে পরিবার, সমাজ এবং দেশ-জাতি। অন্তর্গতভাবে আমরা পরিণত হচ্ছি একটি অন্তঃসারশূন্য মেধাহীন জাতিতে।

এমতাবস্থায় আমরা বাংলাদেশের বৃহৎ পাঠকশ্রেণিকে পরিচিত করাতে চাই আরবের সঙ্গে। আরব তথা 'ইস্টার্ন' ও 'মিডলইস্টার্ন'–প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য-এর বিশ্বাসবিধৌত ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে। আরবীয় সাহিত্য ও ফিকশন ইংরেজির চেয়ে অনেক বেশি ঐতিহাসিক, অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং গুণগত দিক দিয়ে পৃথিবীর যেকোনো ভাষার চেয়ে শক্তিশালী।

সবচে আশাবাদের কথা হলো, আরবি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাভাষা ও বাঙালির মিলন আজ থেকে হাজার বছর আগে। এ দুই ভাষা শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে একসঙ্গে এ বঙ্গদেশে সৃষ্টি করেছে অনুপম সব সৃষ্টি। আরবি ভাষা ও আরবের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ শত-সহস্র বছরের যেমনি, তেমনি এ ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের ধর্মীয় মানসেরও বড় পরিচায়ক। সুতরাং আমাদের প্রচেষ্টা আশা করি বিফলে যাবে না।

আমাদের এ প্রচেষ্টায় একজন পাঠক হিসেবে আপনাকে স্বাগতম।

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অপেক্ষা	১৭
মজলুম	২৫
পাপের প্রতিশোধ	৩১
কর্নেল	৩৫
সুবিচার	৩৯
ভাগ্যের গুলি	৪৭
ঘাতকের শাস্তি	৫১
বিবাদীর শপথ	৬১
ভাগ্য কথা বলে	৬৯
ভাগ্য প্রহরী	৭৫
কৃষকহত্যার শাস্তি	৮১

www.pathagar.com

আসমানি আদালত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অপেক্ষা

এক

সে।

কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে আইন পেশায় জড়িত। কিছুদিন আদালতে আইন পেশায় কাজ করার পর বাগদাদের সেনা আদালতের মামলা লেখার চাকরি নিলো।

আদালতে তার কর্মস্থল ও বাগদাদ শহরের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে সে বাগদাদে আসতো। যাতায়াত করতো প্রাইভেটকারে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কাজ শেষে রওনা করতো, এক ঘণ্টায় পৌঁছে যেতো বাগদাদে। বৃহস্পতিবার বিকেল ও শুক্রবার কাটতো তার বাগদাদে।

সপ্তাহের শুরুতে শনিবার ভোরে আবার চলে যেতো আপন কর্মস্থলে।

বাগদাদের উপকণ্ঠে 'কারদা' এলাকায় সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতো পারিবারিক পরিবেশে। পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবার ও জিনিসপত্র কিনে বাকি সময়টা কাটাতো চিত্তবিনোদনে।

সে ছিলো শক্তিশালী যুবক। অবিবাহিত। দীন-ধর্ম সভ্যতা কালচার কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতো না। শয়তানের খপ্পরে পড়ে প্রায়ই নাচের আসর ও নাইট ক্লাবে সময় কাটতো তার। তার কিছু বন্ধু তাকে এমন অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করতো। বিরত রাখতো সৎকাজ থেকে।

সে ছিলো আধুনিক-মডার্ন যুবক। অন্যায় কাজ বেশি করতো এবং কল্যাণকর কাজে তার অনুপস্থিতি ছিলো নিয়মিত। টাকার কোনো

www.pathagar.com

অভাব ছিলো না তার। আবার ধর্মীয় শিক্ষার ছায়াটুকু ছিলো না তার মাথার ওপর। দীর্ঘ অবসর সময় সে জানতো– আধুনিকতার অর্থ হলো সামাজিক রীতি-নীতি উপেক্ষা করা। উদ্দাম জীবনযাপন করাই হলো আধুনিকতা। এর ব্যত্যয় মানে– সভ্যতা থেকে পিছিয়ে পড়া, জড়তা ও পশ্চাৎপদতার হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া। ইউরোপের যুবকরা যে জীবন উপভোগ করে, এ যুবক সেই বিলাসী জীবনে বিশ্বাসী।

দুই

কোনো এক বৃহস্পতিবারে সে বাগদাদে এলো। বাসায় সামান্য আরাম করে 'সারাই' মার্কেটে গেলো। অভ্যাস অনুযায়ী এলোমেলো ঘোরাফেরা করলো কিছুক্ষণ। সারাই মার্কেটে কিছু বইয়ের দোকান ছিলো এবং কিছু বস্ত্র বিপণি, পুরুষরা যেতো বইঘরে আর নারীরা বস্ত্র বিপণিতে।

বস্ত্র বিপণিতে নারীরা ঘুরতো পাতলা পোশাকে। খোলামেলা। নানা ডিজাইন ও ফ্যাশনের কাপড় পরতো তারা। কিছু নারী হিজাবও পরতো। সবধরনের নারীই কাপড় কিনতে আসতো এখানে, আবার অনেকেই উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা করতো মার্কেট সংলগ্ন দোকানগুলোতে।

নদীর তীরবর্তী সারাই মার্কেটের কিছু দোকান ছিলো নগ্ন নারীদের। যেনো তারা শয়তান-কন্যা। মিষ্টিমধুর কথায় পুরুষদের আকৃষ্ট করতো। কমনীয় ভঙ্গিমায় যুবকদের সামনে নিজেদের শারীরিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতো। কমনীয় কণ্ঠে আহ্বান করতো। তাদের জাদুকরী কথার ঢঙে মাঝে মাঝে শয়তানও কুপোকাত হয়ে যেতো।

সারাই মার্কেটের বইয়ের দোকানগুলো ক্রেতাশূন্য ছিলো। বইক্রেতারা সেই পুরনো পাঠক। অথচ সারাই মার্কেটের বস্ত্র বিপণিগুলো ক্রেতায় ভরপুর। কলরব। কোলাহল। নানা প্রকার ক্রেতার আনাগোনা। প্রতিদিন ফ্যাশনের পরিবর্তন। নতুন ফ্যশনের আমদানি হয় দেদার। বইয়ের দোকানগুলো ক্রেতাশূন্যতায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বস্ত্র বিপণিগুলোতে নানা আবেগ-উচ্ছ্বাসের কলরোল শোনা যায়

www.pathagar.com

হরদম। মনে হতো– জীবনের সমস্ত আয়োজন ওসব দোকানেই সাজানো আছে।

তিন

সারাই মার্কেটে সেই যুবক ডানে-বামে পায়চারী করলো কিছুক্ষণ। মার্কেটের এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ঘোরাফেরা করলো। সে দেখতে পেলো রূপসী দুটি মেয়েকে। তারা বিক্রেতার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছে। দাম-দর করছে হেসে হেসে। যুবক মনোযোগ দিয়ে মেয়ে দুটোর কথা শুনে যাচ্ছে।

এক ফাঁকে যুবকটিও একটি কাপড়ের মূল্য জিজ্ঞেস করলো বিক্রেতার কাছে। একটি মেয়ে এগিয়ে এলো এবং কোন ধরনের কাপড় নিলে তার জন্য ভালো হবে তা দেখালো।

যুবক মেয়েটির আগ্রহ দেখে বললো, তার এ জীবনে দেখা সেরা রূপসীর জন্য সবচেয়ে দামি ও সেরা পোশাকটি ক্রয় করবে সে এবং প্রথম দেখাতেই যাকে ভালোবেসেছি তাকে এই কাপড়টি উপহার দেবে।

যুবক মূল্যবান কাপড়টি কিনে দোকানির মূল্য পরিশোধ করলো। এবার সে হাসি মুখে কাপড়টি সেই লাস্যময়ী মেয়েটিকে উপহার দিয়ে বললো, তুমিই সেই মেয়ে, প্রথম দেখাতেই আমি যার প্রেমে পড়ে গেছি। তুমি এবং তুমিই।

মেয়েটি বিস্মিত হলেও শোকরিয়া জানালো। যুবককে ইঙ্গিত করলো তাদের পেছনে হাঁটতে। যুবকটি মেয়ে দুটির পেছনে হাঁটছিলো। তারা 'আকুলিয়া' মহল্লায় প্রবেশ করলো।

মেয়েটি যুবকটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অপেক্ষা করতে বললো। যুবকটি মেয়েটির বাসার কাছেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। মেয়েটি বাসা থেকে বের হয়ে যুবকের কানে চুপিসারে বললো– জুমআর দিন দুপুরে এই বাসায় সে তার অপেক্ষায় প্রহর গুনবে।

মেয়েটি এ কথা বলে বাসায় ফিরে গেলো। যুবকটি মেয়েটির বাসাটা ভালোমতো চিনে নিজেকে বাহবা দিতে দিতে নিজের পথ ধরলো। ভাবলো, শিকার দামী। মূল্যবান এই শিকার।

www.pathagar.com

যুবক নিজের বাসায় এলো খুশি মনে। প্রফুল্লচিত্তে। অভ্যাসের উল্টো দ্রুত বাসায় ফেরায় পরিবারের সদস্যরাও আনন্দিত। সাধারণত সে জুমআর রাতের শেষ প্রহরে বাসায় ফিরতো।
রাতের প্রথম প্রহরে সে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিলো। তার আগে পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দঘন সময় কাটালো। তারাও তার প্রতি মমতা প্রকাশ করলো। তার বাবা তার মাকে যুবক ছেলের প্রতি প্রত্যাশার কথা জানিয়ে বললো– আল-হামদুলিল্লাহ। ছেলে মনে হয় স্বাভাবিক চিন্তা করছে। বাস্তবতা বুঝেছে। বিয়ে করবে মনে হচ্ছে। আমরা তাকে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করে যাবো। ছেলের এখন বিয়ের বয়স।
মায়ের কোমল মন। মা তার ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন লালন করতেন।

চার

সে রাতে যুবক বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানা স্বপ্ন দেখলো। রাত কাটালো বিনিদ্র। সামান্য তন্দ্রাও এলোনা চোখে। সূর্য পূর্ব দিগন্তে উঁকি দিলো। ভোরেই সে শয্যা ত্যাগ করলো। ঘরে গানের সুরধ্বনি। মনে আনন্দের বন্যা। স্বপ্নের বুনন।
জুমআ দিবসের সকাল ও দুপুরের মধ্যবর্তী সময় কীভাবে কাটাবে এ নিয়ে তার ভাবনা। ঘড়ির কাঁটার দিকে তার দৃষ্টি। কখন সময় কেটে দুপুর হবে এই আশায়।
সাক্ষাতের নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগে সে অভিজাত পোশাক গায়ে জড়ালো। সাজলো বাহারি সাজে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেশ বিন্যাস করলো। দামি পারফিউম ছিটালো গায়ে। নতুন বরের সাজে সজ্জিত হলো। পরিপাটি হয়ে তার প্রিয়তমার বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। হাঁটতে লাগলো আকুলিয়া মহল্লার দিকে।
নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে সে ঘরের দরজা জানালা উন্মুক্ত পেলো। কাউকে পেলো না ঘরের আঙিনায়। গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে দেখলো সেই দুই কন্যার একজন দামি সোফায় ঘুমন্ত। রঙ্গিন কাপড় গায়ে জড়িয়ে শায়িত। শরীরের অঙ্গ দৃশ্যমান। কমনীয় ভঙ্গিমায় শায়িত।

www.pathagar.com

গতকাল যার সঙ্গে কথা হয়েছিলো, এ মেয়েটি সে নয়।

সে নিজেকে প্রবোধ দিলো। এই বাসার অন্য কামরায় হয়তো সেই দুই কন্যার অপরজন তার জন্য অপেক্ষা করছে।

অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যুবক ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে। ঘুম যেনো তার দেহের লাবণ্য বাড়িয়ে দিয়েছে। রূপসীরা ঘুমালেও তাদের রূপ যেনো জেগে থাকে।

যুবক রূপসীর লাবণ্য দেখায় বিভোর। কল্পনায় স্বপ্নের ফানুস ওড়াচ্ছে। আনন্দঘন সময় কাটছে যুবকের।

হঠাৎ সুঠামদেহী দীর্ঘকায় একটি লোক যুবকের মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো। সম্বিৎ ফিরে পেলো যুবক এবং সজাগ হলো স্বপ্নের জগৎ থেকে।

পাঁচ

যুবকের হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে গেলো। হৃদয় কম্পিত হলো। জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো। আগন্তুক স্বাভাবিকভাবে অভিনন্দন জানালো যুবককে। স্বাগত জানালো। যুবক এবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। ঘরের বিশেষ কামরায় লোকটি যুবককে ডেকে নিলো।

কামরাতেও তাকে স্বাগত জানালো। সরল ভাষায় আলাপ করলো আগন্তুক। যুবকের আতংক কেটে গেলো। স্বাভাবিক হলো সে।

লোকটি কামরায় যুবককে রেখে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঘুমন্ত তার স্ত্রীর কাছে গেলো। স্ত্রীকে জাগিয়ে খাবার দিতে বললো। দুজন মজাদার খাবার খেলো। খোশগল্প করলো দুজনে। খাবার টেবিলে ফল ও চা।

লোকটি যুবককে জিজ্ঞাসা করলো–

: দাবা খেলতে পারো তুমি?

: হাঁ, নিশ্চয়।

লোকটি দাবার ছক আনলে দুজন আগ্রহভরে দাবা খেললো।

মুয়াজ্জিন মাগরিবের আজান দিলো।

মাগরিবের পর দাবা খেলার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো।

www.pathagar.com

কেটে গেলো রাতের দু'ঘণ্টা। লোকটি অনুমতি নিয়ে পাশের কামরায় গেলো এবং একটি গুলিভর্তি রিভলবারসহ ফিরে এলো। তাতে সাতটি গুলি। সাতজনকে পরপারে পাঠানোর আয়োজন।

ছয়

ঘরের মালিক ছিলো উচ্চপর্যায়ের সরকারি চাকরিজীবি। সৎ হিসেবে পরিচিত। উত্তম চরিত্রের অধিকারী। চাকারিজীবিদের কাছে তার সুখ্যাতি প্রসিদ্ধ। ঈর্ষণীয় ছিলো তার মর্যাদা। স্ত্রীর সাথে তার ছিলো গভীর সুসম্পর্ক। সতেরো বছর কাটিয়েছে তারা এক ছাদের নিচে। কখনো বিভেদ হয়নি তাদের মধ্যে বা কোনো স্মরণযোগ্য ঝগড়া।
যুবক লোকটির পদমর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলো না এবং তার জানা ছিলো না তার সামাজিক মর্যাদা। দু'জন দুই প্রজন্মের। তার এলাকা ছিলো কারদা, যা আকুলিয়া থেকে দূরে।
লোকটি রিভলবার রাখলো টেবিলে। শান্তচিত্তে। দাবার ঘুঁটিগুলো উঠিয়ে নিলো স্বাভাবিকভাবে। মুখে মিষ্টি হাসি। শান্ত ও স্বাভাবিক।
যুবক বিস্মিত হলো। তার সামনে টেবিলে রাখা রিভলবার। লোকটি শান্ত এবং হাস্যোজ্জ্বল।
যুবকের কাছে এক একটি মুহূর্ত মনে হচ্ছে কয়েক বছর। কী করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। কামরায় নিস্তব্ধতা। সুনসান নীরবতা। যুবকটি কিছু বলতে চাইলো। কিন্তু জড়তা ও ভয়ের কারণে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলো না। তার মাথা কাজ করছে না। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। সে কাঁপতে লাগলো। বাগদাদের প্রচন্ড গরমের মধ্যেও ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে গেলো। ভীষণ ভয় পাচ্ছে সে।

সাত

লোকটি দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে বললো–
আরামের সময় শেষ। কল্পনার সময় নেই। বাস্তবতায় ফিরে আসি আমরা। মিথ্যা তোমাকে মুক্তি দেবে না। বলো এবার, কেনো আমার বাড়িতে এসেছো?

www.pathagar.com

যুবকটি রিভলবারের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি গুলির অপেক্ষায়। লোকটি যে কোনো সময় ছুঁড়তে পারে একটি গুলি।

যুবক হতচকিত হলো। জড়োসড়ো হলো। লালা গড়িয়ে পড়লো মুখ থেকে এবং এই বাড়িতে আসার পেছনের গল্পটা বললো। বাসার মালিক গভীর মনোযোগসহ পুরো ঘটনা শুনলো।

লোকটি তার স্ত্রীকে ডাকলো। সলজ্জ। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলো– গতকাল কোথায় গিয়েছিলে?

স্ত্রী বললো–

: সারাই মার্কেটে গিয়েছিলাম। এক চাকরিজীবির স্ত্রীর সঙ্গে। সে কাপড় কিনে নিজের বাড়িতে ফিরে গেছে।

লোকটি স্ত্রীর কথা শুনলো। এরপর স্ত্রী ও যুবককে নিয়ে চলে গেলো সেই চাকরিজীবির স্ত্রীর কাছে।

আট

লোকটি সেই চাকরিজীবির বাড়িতে গেলো। সাথে তার স্ত্রী ও যুবক। সেই বাড়ির গৃহস্বামী বিস্মিত হয়ে স্বাগত জানালো তাদের। সালাম-কালামের পর লোকটি কাপড় কেনা সম্পর্কে অবহিত হলো এবং গতকালের পুরো ঘটনা জানলো।

এরপর তারা সে বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। ফেরার পথে লোকটি যুবকের বাড়ির পথ জানতে চাইলো আর গাড়ি করে তাকে পৌঁছে দিলো।

যুবকটি বাসায় এলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে।

যুবকটি উপদেশ কামনা করলো লোকটির কাছে। লোকটি বললো–

: এ জাতীয় ঘটনা আর দ্বিতীয়বার ঘটাবে না। মানুষের ইজ্জত-আ সংরক্ষণ করবে। কেউ যদি অন্যের ইজ্জত-আর অসম্মান করে আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন।

লোকটি নিজ বাসায় ফেরার পথে এবার তার স্ত্রীকে ঘটনা খুলে বললো। তার স্ত্রী এর কিছুই জানতো না।

www.pathagar.com

যুবক শিখলো অনেক কিছুই। যুবকের পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দোয়া করতো সন্তানের কল্যাণের জন্য এবং সঠিক পথের সন্ধানের জন্য। ছেলে যেনো সুপথে থাকে। আল্লাহ্ কবুল করলেন তাদের দোয়া। বিস্ময়কর এ ঘটনার মাধ্যমে।

যুবক শান্ত-স্বাভাবিক হয়ে পিতা-মাতাকে বললো–

: আমি দ্রুত বিয়ে করতে চাই। উদ্ভ্রান্ত জীবন ছেড়ে আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি। বিপথে আর চলবো না।

পিতা-মাতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলে পুরো ঘটনা বললো।

পরের সপ্তাহের ছুটিতে যুবক সেই লোকটির সাথে যোগাযোগ করলো এবং পাত্রী নির্বাচনে সহযোগিতা কামনা করলো। আর বললো, তার পিতা-মাতার পর সেই লোকটিই তার পিতা।

লোকটি মৃদু হাসলো এবং পরের দিন জুমআর পর দুপুরে খাবারের দাওয়াত দিলো।

সে এলো। লোকটির বাড়িতে। জুমআর দিন।

দুপুরে খাবার টেবিলে যুবকটি রূপসী এক কন্যাকে দেখলো। লাবণ্যময়।

মেয়েটি লোকটিকে সম্বোধন করলো– বা-বা!

যুবকটি লোকটিকে বললো-

: পেয়েছি! পেয়েছি! আমি তাকেই চাই!!!

লোকটি বললো–

: এ মেয়েটিই তোমার জন্য। বিয়ে দেব তোমার সাথে।

এক সপ্তাহ পর দুজনের বিয়ে হলো। যুবকটি পেলো রূপসী এক স্ত্রী। যুবকটি এ ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানে দিন কাটাতে লাগলো এবং যুবকের পিতা-মাতার পর সেই ছিল তার অভিভাবক।

অপেক্ষা ভালো। ধৈর্য সুফল বয়ে আনে।

দ্রুত কিছু কামনা করা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মজলুম

একজন গরু ব্যবসায়ী। ইরাকের অধিবাসী। ইরাক-ইরান থেকে গরু ক্রয় করতো। বিক্রি করতো সিরিয়ায়। কখনও মিসরে। বিক্রয়লব্ধ টাকায় সে ক্রয় করতো বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য। পণ্যসহ সে আবার ইরাকে ফিরতো।

লোকটি ছিলো পুণ্যবান। নামাজ-রোজায় পাবন্দ। আল্লাহ্র হক এবং মানুষের হক আদায় করতো। পরিচ্ছন্ন ও খোদাভীরু লোকটি দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন ও অভাবীদের দান-খয়রাত করতো। তার সম্পদে অন্যের অধিকার আছে–এই ধারণায় সে বিশ্বাসী। সে দানশীল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এক বাণিজ্যসফর। এই বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিলো ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। এই সফরে লোকটি ঝড়ের কবলে পড়ে।

প্রচণ্ড তুষারপাতে ধ্বংস হয় তার বাণিজ্যপণ্য। গরুগুলোও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবিত থাকে মাত্র চারটি গরু। তার সফরসঙ্গীরাও অন্যত্র চলে যায়।

লোকটি সিরিয়ার হলব শহরে যাবার ইচ্ছে করে। সাধ্যানুযায়ী ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছে ছিলো তার। পাওনাদারদের কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় নেবে। এ বছর ব্যবসায় লাভ হয়নি। আগামীতে এই অসচ্ছলতা কেটে সচ্ছলতার মুখ দেখবে এই আশায় সে হলবের পথে যাত্রা করলো।

www.pathagar.com

এক বিকেলে।

মুসেল থেকে লোকটি হলব শহরে যাচ্ছিলো। রাতের আঁধার নেমে এলো। সে এক গ্রামের একটি বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় আওয়াজ দিলো।

বাড়ির মালিক বের হলো। লোকটি সমস্যার কথা বললো। এখানে রাত যাপনের আগ্রহ প্রকাশ করলো। ভোরে চলে যাবে।

সে যুগে কোনো আবাসিক হোটেল ছিলো না। ছিলো না খাবারের হোটেলও। মুসাফির বাধ্য হয়ে কারো বাড়িতে আশ্রয় নিতো। লোকজনও মেহমানকে বরণ করে নিতো। নিজেদের বাসস্থানেই রাতযাপনের ব্যবস্থা করতো এবং খাবারের আযোজন করতো। এর বিনিময়ও গ্রহণ করতো না মেজবান।

গ্রামের মেজবান মেহমানকে স্বাগত জানিয়ে রাতযাপনের ব্যবস্থা করলো। গোয়ালঘরে গরুগুলোকে রাখতে দিলো। মেহমানের জন্য রাতের খাবার এবং গরুর জন্য ঘাসের ব্যবস্থা করলো।

দুই

গ্রামের এই লোকটি ছিলো দরিদ্র। অতি বর্ষণে তার গবাদিপশু মারা গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফল-ফসল।

লোকটি ছিলো বিবাহিত। যুবক এক ছেলে ছিলো তার। দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর। এক কক্ষে তার স্ত্রী থাকতো। অন্য কক্ষে ছেলে।

রাতে মেহমানকে ঘিরে গল্প শুরু হলো। গভীর রাত পর্যন্ত গল্পের আসর জমলো। মেজবান জানতে পারলো মেহমান ঋণী। অনেক সম্পদের মালিক।

রাতের দ্বিতীয় প্রহর।

মেজবান স্ত্রীসহ তাদের কামরায় নিদ্রার জন্য গেলো।

ছেলের কামরায় মেহমান ও ছেলের ঘুমানোর ব্যবস্থা হলো। কামরার ডানপাশে ছেলে শয়ন করলো। বামপাশে মেহমান। রাতে আরও কিছুর প্রয়োজন আছে কি-না তা জানতে চাইলো মেজবান। প্রয়োজনীয় পানিও রাখলো মেহমানের জন্য। লোকটি মেহমান ও ছেলেকে রেখে নিজ কামরায় ঘুমোতে গেলো।

www.pathagar.com

গভীর রাত

লোকটির স্ত্রী চুপিসারে স্বামীকে বললো, আমরা আর কতোকাল দরিদ্র হয়ে থাকবো? আমাদের আজকের মেহমান ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার সম্পদ ও গরুগুলোর মালিক হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছি।

আমরা ক্ষুধার্ত। মৃত্যু মুখে পতিত অভাবের তাড়নায়। একবেলা খাই। আরেক বেলা উপোস করি। গ্রামে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। আমাদের খাদ্য-পানীয় এবং সম্পদ বলতে কিছু নেই।

আজ আমাদের বাধাহীন সুযোগ। এমন সুযোগ আর আসবে না। আমরা তার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারি। গরুগুলোর মালিক হতে পারি। এতে আমাদের জীবন হবে সচ্ছল এবং আমাদের ছেলের জীবন হবে আনন্দঘন।

লোকটি স্ত্রীকে বললো, তিনি আমাদের মেহমান। তার মাল ও গরু কীভাবে ছিনতাই করি? অনুচিত। অনৈতিক।

স্ত্রী বললো, হত্যা করো মেহমানকে। গর্তে ফেলে দেবো। কেউ দেখবে না।

স্ত্রী স্বামীকে বারবার হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলো। শয়তানও কুমন্ত্রণা দিলো। শয়তান স্ত্রীর কথাকে সুসজ্জিত করে প্রকাশ করলো।

স্ত্রী বললো, দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচার ইচ্ছায় তাকে হত্যা করো। আমাদের বাঁচা প্রয়োজন। প্রয়োজনে অবৈধ কাজ ও বৈধ হয়ে যায়।

স্বামীকে অবশেষে হত্যার নেশা পেয়ে বসলো। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো, মেহমানের সম্পদ ছিনিয়ে নিতেই হবে যে কোনো মূল্যে। যে কোনো উপায়ে।

তিন

রাতের তৃতীয় প্রহর।

গভীর রাত। নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক। অন্ধকার ছেয়ে আছে ঘরে-বাইরে। ঘরেও প্রদীপ নেই। স্বামী লোকটা ছুরি বের করে শান দিলো। ছেলের কক্ষের দিকে চুপিসারে হাঁটলো। সে কক্ষেই মেহমান। পেছনে স্ত্রী। উৎসাহিত করে যাচ্ছে স্বামীকে।

www.pathagar.com

মৃদুপায়ে তারা কক্ষের বামপাশে গেলো। মেহমান যেখানে থাকার কথা। অন্ধকারে শরীর স্পর্শ করে গলায় ছুরি চালিয়ে দিলো। জবাই করলো ছাগল যেভাবে জবাই করা হয়। স্ত্রী তাকে হত্যায় সহযোগিতা করলো। নিথর দেহটা দুজনে টেনে কক্ষের বাইরে আনলো। কক্ষের বাইরে এসে দেখলো তারা তাদের ছেলেকে জবাই করেছে।

গাধার মতো গর্জন করে তারা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তদের গর্জনের আওয়াজে জেগে উঠলো মেহমান। জেগে উঠলো প্রতিবেশীরাও। সবাই দেখলো, ছেলেটির গলাকাটা লাশ পড়ে আছে। আর মা-বাবা নিথর দেহে অজ্ঞান হয়ে আছে। মেহমান ও প্রতিবেশীরা স্বামী-স্ত্রীর মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো। পিতা-মাতার জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করলো প্রতিবেশীরা।

জ্ঞান ফিরলো তাদের। অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করলো স্বামী-স্ত্রী। প্রতিবেশীরা পুলিশকে খবর দিলো। পুলিশ এলো দ্রুত। গ্রেফতার করলো মেহমান ও পিতা-মাতাকে।

পুলিশ অনুসন্ধানে নামলো।

রাতে গল্প শেষে ছেলেটি মেহমানের সঙ্গে আরও কিছু সময় কাটালো আলাপ করে। দীর্ঘ আলাপের একপর্যায়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মেহমানের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটি। মেহমান তাকে জাগায়নি। চাদরে আচ্ছাদিত করে ছেলের জন্য নির্ধারিত জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাতে মেজবান হত্যার মতলবে ছেলের কক্ষে এসেছে। ভেবেছে, ছেলে তার নির্ধারিত শয্যায় আর মেহমান তার শয্যায়।

তার ধারণা ছিলো, তারা যার যার বিছানায় শয়ন করেছে। মেহমানকে হত্যা করতে গিয়ে তার নিজের ছেলেকেই হত্যা করেছে।

প্রতিবেশীরা ছেলের লাশ দাফন করলো। পুলিশ জেলখানায় পাঠালো হত্যাকারী পিতাকে।

চার

মেহমান ও মেজবানের এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লো মানুষের মাঝে।

www.pathagar.com

ফুরাত নদীর তীরে এক হাবুর গাছের শাখায় একজোড়া কবুতরের কথোপকথন,

কপোত : মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী। মানুষের রিজিক নির্ধারিত। এরা হালাল তালাশ করে।

কপোতী : মৃত্যু বড় প্রহরী। আল্লাহ পর্যবেক্ষক। তিনি হিসাব গ্রহণকারী। সৃষ্টজীব নিদ্রায় গেলেও তিনি থাকেন বিনিদ্র। নির্ধারিত সময়ের আগে কারো মৃত্যু হয় না।

কপোত : তুমি আল্লাহ্র বিধান সংরক্ষণ করো। আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন। যে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং পাপমুক্ত জীবন যাপন করে; আল্লাহ্ তার জন্য নানা পথ খুলে দেন। মানুষ যদি অন্য মানুষের উপকার করতে থাকে আল্লাহ্ তার উপকারের বিনিময় দেন।

কপোতী : জুলুম অত্যাচার দীর্ঘস্থায়ী নয়। যদি অবিরাম হয় তাহলে জুলুম জালেমকে বিধ্বস্ত করে। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার স্থায়ী ফল দেয় এবং সমৃদ্ধ করে ন্যায়বিচারককে। জুলুম নানা অন্ধকারের সমষ্টি। ন্যায়বিচার আলো। আলোর ঝলক হলো রিজিক ও শান্তি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাপের প্রতিশোধ

বড় এক ব্যবসায়ী।

তার ব্যবসা ছিলো ইরাক থেকে সিরিয়া। সে সিরিয়ায় শস্য বিক্রি করতো। সেখান থেকে আমদানি করতো সাবান ও বস্ত্র। লোকটি ছিলো ধার্মিক। লভ্যাংশ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতো। জাকাত দিতো। দান-খয়রাতও করতো নিঃস্বদের মাঝে।

সে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতো। কোনো ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিতো না। সে বলতো, সম্পদের জাকাত সম্পদ। সম্মানের জাকাত হলো অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করা।

সে মহল্লার অসুস্থদের সেবা করতো। প্রতিদিন খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করতো। বাসার কাছে ছোট্ট মসজিদে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করতো। মসজিদের প্রতিবেশী সবার ব্যাপারে খোঁজ নিতো। প্রতিবেশী কেউ অসুস্থ হলে সে তাঁর খোঁজ নিতো। কারো আর্থিক প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করতো। মুনাফিকদের পরিবারেরও সে দেখভাল করতো।

সেই ব্যবসায়ীর ছিলো এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক ছিলো।

একদিন

সে তার একমাত্র ছেলেকে ব্যবসায়ী কাজে সিরিয়ায় যাওয়ার প্রাক্কালে বললো, আমি বুড়ো হয়েছি। সফরে আগের মতো সামর্থ্য নেই আমার।

www.pathagar.com

আল্লাহর রহমতে তুমি এখন যৌবনে। শস্যভাণ্ডার নিয়ে তুমি সিরিয়ার হালবে যেতে পারো। ফেরার সময় সাবান ও কাপড় নিয়ে আসবে। তাকওয়া অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। আর আল্লাহকে ভয় করে চলবে!
তোমার বোনের ইজ্জত রক্ষা করবে তুমি।
এই ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের। তখন ছিলো না রেলপথ। ছিলো না সড়ক ও জনপথ।

দুই

ছেলে তার বাবার ব্যবসা নিয়ে নানা মনজিলে সফর করলো। রাত জেগে সে বাণিজ্যকাফেলার পাহারাদারী করতো। তাদের স্বার্থ রক্ষা করতো। কাফেলার লোকদের অবস্থার খোঁজ রাখতো।
হলব শহরে শস্য বিক্রি করলো। উন্নতমানের সাবান ও কাপড় ক্রয় করলো।
ব্যবসার কাজ শেষে একসময় মুসেলের দিকে ফেরার প্রস্তুতি নিলো।
হলব থেকে ফেরার কিছুদিন আগের কথা, সে রূপসী এক মেয়েকে দেখলো। মেয়েটির সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়ে গেলো। মেয়েটি প্রেম জাগিয়ে তুললো তার মনে।
সূর্যাস্তের পর। তার কুপ্রবৃত্তি মেয়েটির কপালে চুমু এঁকে দিতে তাকে প্ররোচিত করলো। কিছু না ভেবেই মেয়েটিকে সে চুমু দিয়ে বসলো। চুমু দিয়েই সরে পড়লো এবং মেয়েটিও চলে গেলো। এবার সে নিজের আচরণে লজ্জিত হলো। নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলো।
সাথীদের কাছে বিষয়টি গোপন রাখলো সে। কারো কাছেই কিছু বললো না। কিছুদিন পর স্বদেশে ফিরলো।
সফরে থাকাকালীন সময়ের কথা।
একদিন তার পিতা ঘরের আঙ্গিনায় পায়চারি করছিলো। ভিস্তিওয়ালা এসে দরজায় কড়াঘাত করলো। দরজা খোলার জন্য তার বোন বের হয়ে এলো। ভিস্তিওয়ালা পানির মশক বহন করছিলো। সে মেয়েটির প্রেমে আকৃষ্ট হলো। যুবকের বোনটি দরজা বন্ধ করার অপেক্ষায়।

www.pathagar.com

পানিবিক্রেতা চলে গেলেই সে বন্ধ করবে দরজা। শূন্য কলসি নিয়ে ভিস্তিওয়ালা ফিরে এলো দরজায় এবং দ্রুত মেয়েটিকে চুমো দিয়ে বসলো। কোন দিকে না তাকিয়ে পানিবিক্রেতা দ্রুত প্রস্থান করলো। কামরার জানালা থেকে সব দেখলো মেয়েটির পিতা। চুমুর দৃশ্য। মনে মনে বারবার পড়লো লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। পানাহ্ আল্লাহ্‌র।

পিতাও কিছু বললো না। বললো না মেয়েও কিছু।

দ্বিতীয় দিন। পানিবিক্রেতা নিয়মমাফিক সেই লোকটির ঘরে এলো। লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখলো। মেয়েটি তার জন্য দরজা খুলে দিলো। কিন্তু এবার ভিস্তিওয়ালা আগের মতো আচরণ করলো না। দীর্ঘ দু'বছর ধরে সে এই বাসায় পানি সাপ্লাই দেয়। মহল্লাহ্‌র সবগুলো বাসায় সে পানি বিতরণ করে। কোনোদিন কেউ তার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। কোনো মেয়ের প্রতি কখনো অবৈধ দৃষ্টিপাত করার ইচ্ছেও হয়নি তার।

বয়স তার পঞ্চাশের কোঠায়। যৌবনের উদ্দামতাও হারিয়ে গিয়েছে। সে লাগামহীন, উদ্দাম ও অহংকারীও ছিলো না।

তিন

ব্যবসায়ী যুবকটি মুসেলে ফিরলো। সুস্বাস্থ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে। পিতা তার সুস্থতা ও সম্পদে সন্তুষ্ট হলো না। ছেলেকে তার ব্যবসার লাভ-ক্ষতি, সফরের আনন্দ বেদনা এবং হলবে ব্যবসায়ী অংশীদারদের সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন করলো না।

প্রথমেই পিতা ছেলের কাছে জানতে চাইলো, মুসেল ছেড়ে যাওয়ার সময় থেকে ফেরা পর্যন্ত কী কী কাজ করেছো তুমি?

যুবক ব্যবসা সম্পর্কে বলতে শুরু করলো। পিতা কথা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি কোনো মেয়েকে চুমু দিয়েছো? কখন? কবে? যুবক লজ্জিত হলো এবং অস্বীকার করলো।

www.pathagar.com

যুবকের চেহারা লাল হয়ে গেলো এবং সে ইতস্তত করতে লাগলো। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভেতর যেন সময় থেমে গেলো।

অবশেষে তার পিতা বললো, তোমাকে তোমার বোনের ইজ্জত সংরক্ষণ করতে বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তা করোনি।

এরপর তার বোনকে ভিস্তিওয়ালার চুম্বনের কথা বললো। কীভাবে চুমু দিয়েছে তাও বললো। মূলত এই চুমু সেই চুমুর বদলা। ঋণ পরিশোধ।

যুবক বিচলিত হয়ে স্বীকার করলো তার অপরাধের কথা।

পিতা তার প্রতি তার বোন ও নিজের প্রতি ভীত হয়ে বললো, আমি অবৈধভাবে কোনো আঁচল উন্মোচন করিনি। আমি মানুষের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করি। কোনো স্খলন নেই আমার জীবনে এবং অশ্লীলতাও নেই। তাই আল্লাহর কাছে আমার সুধারণা– আমার পাপের কারণে তা হয়নি।

পানিবিক্রেতা যখন তোমার বোনকে চুমু দিলো তখন আমি নিশ্চিত হলাম–তুমি নিশ্চয় কোনো মেয়েকে চুমু দিয়েছো। তোমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তোমার বোন। একেই বলে যেমন কর্ম তেমন ফল। পাপের প্রতিশোধ।

www.pathagar.com

কর্নেল

এক

বৈরুত।

একটি হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হলাম।

১৯৭২ সালের এক গ্রীষ্মকালে। আমার শারীরিক অবস্থা লুকানোর চেষ্টা করলাম স্বজন ও বন্ধুদের কাছ থেকে। কিন্তু দুঃসংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভালো খবর ধীরগতিতে প্রচারিত হয়।

বন্ধুরা আমাকে দেখার জন্য এলো। খবর না দেওয়ার কারণে তিরস্কার করলো। ফুল ও মিষ্টি নিয়ে আমাকে দেখে গেলো।

হাসপাতালে সরকারি চাকরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন রোগী আমার প্রতিবেশী ছিলো। আমার ইচ্ছে হলো, তাদের সঙ্গে পরিচিত হবো এবং তাদের সমব্যথী হবো। এটির উপায় হলো, ফুল ও মিষ্টিসহ তাদের কাছে হাজির হওয়া। উপহারে কিছু ভালোবাসার কথাও লিখে দেবো। কিছু হাদিয়া দিতে ইচ্ছে হলো নার্সদের। এতে পরে পরস্পরে সম্পর্ক বৃদ্ধি হবে।

একটি ফুলের তোড়া দিতে চাইলাম এক সেনা অফিসারকে। সেও রোগী। বিনিদ্র রাত কাটে তার। অন্যদেরকেও ঘুমুতে দেয় না।

এক সেবিকা এসে আমাকে বললো, এই সেনা অফিসারের সাথে কি আপনার পূর্বপরিচয় আছে?

www.pathagar.com

আমি বললাম, না; কিন্তু সে নিজেও ঘুমায় না। অন্যকেও ঘুমোতে দেয় না। আমাকেও বিরক্ত করে। আমার উপহার পেলে হয়তো আমার প্রতি সদয় হবে এবং আমাকে নির্বিঘ্নে ঘুমুতে দেবে।

সেবিকা বললো, হলে হতেও পারে।

আমি সেবিকার কাছে জানলাম সেই সেনা অফিসার কয়েক মাস যাবৎ হাসপাতালে। নিয়মিত রোগী। পরিবারে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার হাসপাতালে ফিরে আসে।

সেবিকা বললো, হয়তো দ্রুতই ওপারে চলে যাবে। সেও আরাম পাবে। আমরাও তার বিরক্তি থেকে রেহাই পাবো।

দুই

সেই সেনা অফিসার নিজেকে কর্নেল বলে পরিচয় দিতো। ডাক্তার, সেবক-সেবিকা সবাই তাকে কর্নেল ডাকতো।

সে ছিলো প্রবীণ সেনা অফিসার। ফরাসি নিরাপত্তাবাহিনীতে সে চাকরি করতো।

লেবানন তখন ফরাসিদের উপনিবেশ।

তখনও সেনাবাহিনীতে ফরাসি পরিভাষাই প্রচলিত ছিলো। পরিভাষাগুলোর আরবিকরণ তখনও হয়নি।

সেই রোগী সেনা অফিসারের মেধা ছিলো সজাগ। কথাও স্পষ্ট। স্মৃতিশক্তিও প্রবল। হৃদপিন্ড সচল ছিলো তার। প্রাণের এতটুকু স্পন্দনই কেবল তার জীবনে অবশিষ্ট ছিলো। এর বাইরে নানা রোগের আক্রমণ ছিলো তার শরীরে। প্রেসার, ডায়েবেটিস, শিরা-উপশিরা শক্ত হয়ে যাওয়া, ধমনী দুর্বলতা, রক্তে বিষক্রিয়া, কিডনি ড্যামেজ হওয়া, শরীর থেকে গোশতের টুকরো পড়ে যাওয়া এবং আরও নানাবিধ জটিলতা।

সে দিনে জেগে থাকতো। তার কাছে মনে হতো সে সুস্থ। কিন্তু রাতে আবার থাকতো বিধ্বস্ত। রাতে তার মনে হতো দুয়েক ঘণ্টার বেশি সে বেঁচে থাকবে না। ব্যথার কারনে সে নার্সদেরকে ডাকতো। চিৎকার করতো। কখনো সে ট্রেন থামিয়ে দেয়ার বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিতো।

www.pathagar.com

তার ডাক শুনে সেবিকা বা সেবক যখন এসে কোনো সমস্যা পেতো না, তারা তাদের পথে চলে যেতো। নার্সরা তাদের জায়গায় পৌঁছার পরপরই আবার ডাক শুরু হতো একবার। দুইবার। তিনবার।
এভাবে সূর্যোদয় পর্যন্ত চলতো তার এই চিৎকার ও ডাকাডাকি।
ডেকে ডেকে যখন তার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যেতো তখন সে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাতো। সে বাটনে অবিরাম চাপ দিয়ে রাখতো। নার্স আসার পরও সে একইভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করতো।
সেবিকা তাকে সারারাত সঙ্গ দেবে এই প্রত্যাশা করতো সে। তার চাহিদার কথা শুনে সেবক-সেবিকা সাহায্য করতে এলেও কিছুক্ষণ পর সে তাদের নাম ভুলে যেতো। এরপর যথারীতি চিৎকার দিয়ে বাজাতে থাকতো বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।

তিন

এই রোগীর সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম। সে তার জীবনের গল্প বললো। সে বললো–
: আমি চাকরি করতাম ফরাসি নিরাপত্তা বিভাগে। আমার পদ-মর্যাদা ছিলো কর্নেল। আঞ্চলিক পুলিশদের পরিচালনা করতাম। বৈরুতবাসী আমাকে প্রচণ্ড ভয় পেতো। আমার নাম শুনে বীর বাহাদুররাও ভীত-কম্পিত হতো। সন্ত্রস্ত থাকতো।
ফরাসিদের আমার ওপর আস্থা ছিলো। ছিলাম তাদের বিশ্বস্ত। আমি ছিলাম তাদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। আমি তাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দায়িত্ব পালন করতাম।
ফরাসিরা কোনো অপরাধের তদন্তে ব্যর্থ হলে অভিযুক্তকে আমার দায়িত্বে পাঠাতো। আমি শক্তি প্রয়োগ করে অপরাধের স্বীকৃতি আদায় করতাম।
কারো প্রতি দয়া-অনুকম্পা করতাম না। নতুন নতুন শাস্তি উদ্ভাবন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম অপরাধীর ওপর। অপরাধীরা দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে ফরাসিরা যা চাইতো বা আমি যা চাইতাম সেগুলোর স্বীকারোক্তি দিতো। এরপর অপরাধীকে আদালতে উঠানো হতো। আদালত শাস্তির ঘোষণা করতো। রায় দিতো।

www.pathagar.com

আমার শাস্তির প্রকার ছিলো ৮৪ ধরনের।

রোগী আমাকে ৮৪ প্রকার অত্যাচারের বিবরণ দিলো। বিবরণ শুনে আমি শিউরে উঠলাম। এরপর সে বললো–

: আমি এখন আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করছি। আমি অনেক নিরপরাধকে আদালতে হাজির করে শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। অনেক পুণ্যবানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি। আমার প্রভু ফরাসিদের সন্তুষ্টির জন্য এসব করেছি।

বৈরুত থেকে একসময় চলে যায় ফরাসিরা। কর্নেলকে জনতা অভিশাপ বর্ষণ করে। নিজের স্ত্রী, পুত্র, স্বজনও অভিশাপ দিতে থাকে অত্যাচারী কর্নেলকে।

কেউ তাকে ভালোবাসার চোখে দেখতো না। সবার প্রত্যাশা ছিলো দ্রুত তার মৃত্যু হোক। হাসপাতাল ও বাসায় সে চিৎকার করে সবাইকে বিরক্ত ও কষ্ট দেয়।

সে অন্যকেও কষ্ট দেয় এবং নিজেকেও। কর্নেলের প্রভুরা চলে গিয়েছে। সে জনতা ও পরিবারের ঘৃণার পাত্র হিসেবে পরিগণিত।

একসময় সে রাতেরবেলা অনেককে শিকার বানিয়ে শাস্তি দিতো।

আল্লাহও তাকে রাতে শাস্তি প্রদান করেন।

শাস্তিপ্রাপ্তদের অঙ্গে অঙ্গে শাস্তি প্রয়োগ করতো সে।

আজ তার অঙ্গে অঙ্গে রোগ। শাস্তি। আল্লাহ তার কথা বলার শক্তি বাকি রেখেছেন। যেনো সে তার কৃত অপরাধ মানুষকে বলতে পারে।

আল্লাহ তার স্মৃতিশক্তি সতেজ রেখেছেন। যেনো সে লজ্জিত হতে পারে। এখন লজ্জিত হয়েও কোনো লাভ নেই।

তার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন এখনও সচল। যেনো পার্থিব শাস্তি সে ভোগ করতে পারে।

আখেরাতের শাস্তি আরো কঠোর ও ভয়াবহ।

মানুষ কি দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে?

“তোমরা বাস করতে তাদের বাসস্থানে, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছিলো এবং তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছিলো যে, আমি তাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছিলাম। আর আমি তোমাদের কাছে তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম।” (সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৪৫)

www.pathagar.com

সুবিচার

এক

বাগদাদ।

তিন বছর আগের কথা। বাগদাদের 'সালিথ' মহল্লার জলাশয়ে ডুবে যাওয়া এক শিশুকে পাওয়া গেলো মৃত অবস্থায়। শিশুটির বয়স চার। বাগদাদ ব্যথিত হলো এই শোকে। বিস্তারিত খবর ছাপলো সংবাদপত্রগুলো। আসর-আড্ডায় আলোচ্যবিষয় হয়ে উঠলো এই করুণ ঘটনা।

শিশুটি অনিন্দ্য সুন্দর। মাথাভর্তি চুল। মায়াকাড়া মুখ। ফানুসের মতো।

শিশুটির মা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বাবা মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বাসায় একজন বারো বছর বয়সী কাজের মেয়ে আছে তাদের। শিশুটির মা যখন স্কুলে বা বাজারে যেতো সে তার সাথে খেলতো।

শিশুটি ছিলো পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাদের অবলম্বন ও সান্ত্বনা। শিশুর নিস্পাপ কলহাস্যে তাদের ঘর মুখরিত ছিলো।

দুপুরে মা স্কুল থেকে ফিরতো। একদিন ফিরে এসে শিশুর কলরব শুনতে পেলো না। দ্রুত ঘরের আঙিনা ও বাইরে ইতি-উতি করলো। কাজের মেয়ে রান্না ঘরে পাতিল সাফ করছিলো। মা তার কাছে বাচ্চার কথা জানতে চাইলো।

www.pathagar.com

সে বললো, কিছুক্ষণ আগেও তো ঘরেই ছিলো শিশুটি।

দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে আশপাশে শিশুকে খুঁজতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলো প্রতিবেশীদের। পথে চলন্ত পথিকের কাছেও শিশুর কথা জিজ্ঞেস করলো। নিস্ফল হলো এই খোঁজাখুঁজি।

পিতাও বিকেলে ফিরলো স্কুল থেকে। সন্তানের খোঁজে তিনিও অস্থির। দৌড়াদৌড়ি করলো নানা স্থানে। নানাজনের কাছে শিশু সম্পর্কে জানতে চাইলো।

অবশেষে ব্যর্থ হয়ে থানায় গেলো। পুলিশকে জানালো ছেলে হারানোর কথা।

অনুসন্ধানী পুলিশ টিমও শিশুর খোঁজে হন্যে হয়ে লেগে গেলো। কিন্তু বাগদাদের অলিগলি পথে-ঘাটে কোথাও শিশুর সন্ধান পাওয়া গেলো না।

সময় বহমান। দিন-মাস চলে গেলো। কিন্তু শিশুটি কোথায়– তার সন্ধান পাওয়া গেলো না।

দুই

বাগদাদে একদিন প্রবল বৃষ্টি হলো। মুষলধারে বৃষ্টি। বাড়ি-ঘরে উপচে পড়লো পানি। নদী-নালা, ড্রেন ও জলাশয় পানিতে ভরে গেলো। পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ড্রেনের ম্যানহোলের ঢাকনা খুললো। সেখানে ভেসে উঠলো একটি শিশু। মৃত শিশু। সেই হারানো শিশুটির লাশ।

দ্রুত নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা এলো শিশুর বাসায়। শুরু করলো নতুন তদন্ত। ম্যানহোলের ঢাকনা ছিলো ভারী। শিশুটি নিজে তা উঠাতে সক্ষম নয়। সন্দেহের তীর কাজের মেয়ের দিকেই ছোঁড়া হলো। কিন্তু কাজের মেয়েটি শিশুহত্যা কেন করবে?

রহস্যময়।

শিশুর পিতা বললো, কাজের মেয়েটি তার সন্তানের মতো। তারা সন্তানের মতোই তাকে আদর যত্ন করেন।

www.pathagar.com

শিশুর মা বললো, কাজের মেয়েটি বিশ্বস্ত। ভালো চরিত্রের। আগে-পরে তার চরিত্রে কোনো অসংলগ্ন আচরণ পরিলক্ষিত হয়নি।
প্রতিবেশীরা বললো, এই শিক্ষিত পরিবার সেবিকাকে সন্তানের মতোই লালন পালন করে। তারা যা খায়, তাই খেতে দেয়। যে পোশাক পরিধান করে, তাকেও তাই পরায়। শিশুটি যে কক্ষে ঘুমাতো কাজের মেয়েকে সে কক্ষেই থাকতে দেয়। মা কোথাও বেড়াতে গেলে শিশুর সঙ্গে সেবিকাকেও নিয়ে যেতো।
পিতা-মাতা বললো, কাজের মেয়ের ব্যাপারে শিশুহত্যার সন্দেহ অমূলক। কাজের মেয়ের পক্ষে হত্যা করা অসম্ভব। ইচ্ছে করে সে শিশুটিকে পানিতে ডুবিয়ে দেবে– এটা তারা কল্পনাও করে না।

তিন

আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর তদন্ত কমিটি পিতা-মাতা ও প্রতিবেশীদের কথায় আশ্বস্ত হলো না। তারা আরও তথ্য নিতে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলো। তদন্ত কমিটির একজন সেবিকাকে বললো, কেন তুমি শিশুকে পানিতে ডুবিয়ে মারলে?
মেয়েটি কান্না শুরু করলো। কেঁদে কেঁদে অস্বীকার করতে লাগলো।
পিতা-মাতাও সেবিকাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হলো এবং তাকে নির্দোষ দাবী করলো।
তদন্ত কমিটি সেবিকাকে ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে গেলো অধিক তদন্তের স্বার্থে। সেবিকা যেতে চাইলো না। তার মা মেয়ের আঁচল ধরে কান্না করতে লাগলো। মা চেষ্টা করলো যেন তাকে তদন্ত কমিটি মুক্ত করে দেয়। তার মেয়ে কোনোভাবেই শিশুহত্যার সাথে জড়িত নয়।
মায়ের মতো সেবিকার বাবাও মেয়েকে মুক্ত করার আবেদন করলো।
শিশুটির পিতা-মাতা জানালো, সে হত্যা করে থাকলেও তার প্রতি কোনো অভিযোগ বা প্রতিশোধের ইচ্ছে তাদের নেই।
কিন্তু তদন্ত কমিটি বললো, আপনারা বিচারের দাবী থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করলেও জনস্বার্থে তদন্ত করে বিচার করতে হবে। তদন্ত কমিটি সেবিকাকে থানায় নিয়ে এলো। তাকে পৃথকভাবে এবং তার পিতা-মাতাকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো।

www.pathagar.com

সেবিকা বারবার অস্বীকার করছিলো। হালকা প্রহার করলো তদন্ত কমিটি। তখন সে চিৎকার শুরু করলো এবং অস্থির হয়ে কান্না করতে লাগলো।

চার

এক সময় সেবিকা স্বীকার করলো, তার পিতা ম্যানহোলে শিশুটিকে ডুবিয়ে মারতে তাকে বাধ্য করেছে। স্বীকারোক্তি মিথ্যা বলে দাবী করলো পিতা। অস্বীকার করলো।

বললো, শাস্তির ভয়ে এই স্বীকারোক্তি মেয়ের। এটি প্রকৃত ঘটনা নয়। মেয়েটি ছোট। ভয়ে এমন কথা বানিয়ে বলছে। পুলিশ তার পিতাকে নানা প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করেও স্বীকার করাতে ব্যর্থ হলো।

এই ঘটনা তদন্তের পর থানা থেকে আদালতে বিচারের জন্য পেশ করা হলো। মাননীয় আদালত কাজের মেয়েকে পাঁচ বছরের জেলের ফয়সালা ঘোষণা করলেন।

কিশোর সেলে রাখা হলো অপরাধী কাজের মেয়েকে। এখানে তাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দেবারও ব্যবস্থা নিতে বললেন আদালত। কাজের মেয়ের পিতাকে আদালত নির্দোষ ঘোষণা করলেন। দুই মাস হাজত শেষে সে মুক্ত হয়ে চলে গেলো।

পাঁচ

জেলখানায় সেবিকা পুরো ঘটনা স্বীকার করলো। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলো অকপটে।

তার পিতা দুই ভাই থেকে একশত দিনার নিয়েছে। সহোদর দুই ভাই। যাদেরকে মৃতশিশুটির পিতা মারাত্মক অপরাধের কারণে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেছিলো। স্কুলে তাদের অপরাধ ছিলো– তারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতো না এবং চরিত্রহীন ছিলো।

দুই ভাইকে বহিষ্কার করেছিলেন শিশুর পিতা। যিনি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান-শিক্ষক। দুই ভাই ছিল সেই স্কুলের ছাত্র। শিশুর পিতা ছিলেন স্কুলের আইন-কানুন বাস্তবায়নে কঠোর। শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

দক্ষ ও অভিজ্ঞ। বোধ ও বিশ্বাস এবং দেশপ্রেমে অনন্য। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকতেন তিনি এবং যথাযথ দায়িত্ব পালন করতেন। কঠোরভাবে নিয়মনীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি এই দুই ভাইয়ের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেননি। কারো আবেদন-নিবেদনও শোনেননি।

স্কুলের ছাত্র দুই ভাই ব্যর্থ হলো স্কুলে ফিরতে। তারা শিশুর পিতাকে কষ্টের অনলে দগ্ধ করার পরিকল্পনা করে শিক্ষকের বাসার কাজের মেয়েটির পিতাকে টাকা দিয়ে শিশুহত্যার জন্য প্ররোচিত করলো। কাজের মেয়ের পিতাও একই স্কুলের পিয়ন ছিলো।

ছাত্র দুজন জানতো পিয়নের মেয়ে প্রধান শিক্ষকের বাসায় কাজ করে। সে-ই স্যারের শিশুকে হত্যা করতে সক্ষম। শিশুটিকে হত্যা করলে প্রধান শিক্ষককে অন্য কিছুর চে বেশি কষ্ট দেয়া সম্ভব হবে।

কিন্তু আদালত কাজের মেয়ের পিতাকে বেকসুর মুক্ত করে দিয়েছিলো। আদালতেরও কিছু করার ছিলো না। স্বাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদালত শাস্তি ঘোষণা করেন। এই শিশুহত্যার ঘটনার কোনো সাক্ষী ছিলো না। অপরাধী নিজে প্রথমে স্বীকারও করেনি। অপরাধী কীভাবে স্বীকার করবে? স্বীকার করলেই ফাঁসি হবে।

আদালত যাই ফয়সালা করুক, দুনিয়াতে যে শাস্তিই হোক, আসমানী ফয়সালা কথা বললো। শুরু হলো অদৃশ্যের বিচার। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পার্থিব বিচার থেকে রক্ষা পেলেও আখেরাতের বিচার থেকে অপরাধীরা রক্ষা পাবে না।

কাজের মেয়ের পিতা হাজতখানা থেকে মুক্ত হয়ে ভাবলো, স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করা যাক। তার প্রত্যাশা– সে হত্যার বিনিময়ে অর্জিত মুদ্রায় উপভোগ করবে জীবন।

কিন্তু ঘটনা কী ঘটলো?

কাজের মেয়ের পিতা হাজত থেকে মুক্ত হওয়া উপলক্ষে আনন্দ-উল্লাসের জন্য একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো।

আনন্দ-উল্লাস চললো রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের এই আয়োজনে খাদ্য ও পানীয়ের জন্য সেই হারাম টাকা খরচ করা হলো।

www.pathagar.com

পরদিন সকালেই কাজের মেয়ের পিতা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলো। নিথর দেহ। অবশ হয়ে গেলো শরীর।

পরিবারের লোকজন চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো। চিকিৎসা ফি ও ঔষধের টাকা পরিশোধ করতে হলো পরিবারকে। রোগ দীর্ঘমেয়াদী হলো।

চার মাস কেটে গেলো। হত্যার বিনিময়ে অর্জিত টাকা শেষ হলো। ঋণ করতে হলো শেষে। রোগীকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তারিত করতে হলো। সেখানে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা। ফি দিয়ে চিকিৎসার সামর্থ্য নেই এই পরিবারের। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, যক্ষ্মা আর এ জাতীয় নানা রোগে আক্রান্ত হলো কাজের মেয়ের পিতা।

সে হাসপাতালে শুয়ে চিৎকার করতো। এক সময় শক্তি ফুরিয়ে এলো, চেহারা বিকৃত হয়ে গেলো। ক্রাচে করে এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তার এবং এক সেবিকা থেকে অন্য সেবিকার দিকে নিয়ে যেতে হলো রোগীকে।

অন্য রোগীরা মানুষের মমতার পরশ পেলেও এই রোগীর প্রতি মানুষের তীব্র ঘৃণাবোধ ছড়িয়ে পড়লো। রোগীর এই দুরবস্থা নিয়ে ঘরে ঘরে আলোচনা শুরু হলো, এ তো সেই নিষ্পাপ শিশুর হত্যাকারী। এই হত্যাকারী কারো কোনো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেলো না।

ডাক্তাররা প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে রোগীকে হাসপাতাল থেকে বিদায় দিয়ে দিলো। দামি ইনজেকশন পুশ করতে হতো নিয়মিত। স্ত্রীসহ সে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে এলো।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ তার শরীর অবশ হয়ে গেলো। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া থেমে গেলো। হঠাৎ চিৎকার করলো– শিশু শিশু শিশু...।

স্ত্রী জানতে চাইলো, কোন শিশু?

লোকটা বললো, তুমি দেখতে পাচ্ছো না! এই যে শিশুটি তার দুই হাতে আমার গলা চেপে ধরেছে।

লোকটি মাথা ঝুঁকিয়ে দিলো ধীরে ধীরে স্ত্রীর কোলে।

চোখ বিস্ফোরিত হলো।

www.pathagar.com

ধ্বনি ক্ষীণ হলো।

বারবার বললো, শিশু শিশু শিশু...।

ছয়

কাজের মেয়ে জেলখানায় বন্দি জীবন কাটাতে লাগলো। শাস্তির আরও বাকি দুই বছর। মেয়েটির পিতা অভিশপ্ত হয়ে কবর দেশে চলে গেলো। তার বিয়ের যোগ্য তিন কন্যার বিয়ের কোনো প্রস্তাবও এলো না।

কাজের মেয়ের পিতা হারাম সম্পদ দিয়ে আয়েশ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ ছিলেন ঘটনার পর্যবেক্ষক। দুনিয়ার বিচার অবিচার হলেও আল্লাহর বিচার ইনসাফের।

"তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।" (সুরা ইউনুস, আয়াত ৩)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাগ্যের গুলি

এক

গ্রীষ্মকাল।

সমুদ্রতীরে ঘটে যায় নানা গল্প উপন্যাস। বিধ্বংসী ঘটনা ঘটে সি-বিচে।

পাঁচ বছর আগে। এক স্ত্রী স্বামীর কাছে সমুদ্রতীরে বেড়াতে নেওয়ার আবদার করলো। সেখানে তারা সমুদ্রের মৃদুমন্দ বায়ু সেবন করবে। জলকেলি করবে। ঢেউয়ের তালে খেলবে তারা। বাধাহীন জীবনযাপন করবে। অবাধ স্বাধীনতায় অন্তরঙ্গ হয়ে একান্তে সময় কাটাবে। পাশ্চাত্যের স্টাইলে।

এটি সমুদ্রতীরে পরিচিত ও স্বাভাবিক দৃশ্য। একদিন এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয় অন্য একটি পরিবার। সেই পরিবারে সুদর্শন, সুঠামদেহী একটি যুবক ছিলো। দামি গাড়ির মালিক সে। দীন-ধর্মের বন্ধন সে মানতো না। যুবকটি শয়তানি মতলবে এই পরিবারটির ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে। সমুদ্রস্নান একই সাথে করতে যায় পরস্পরে। দেখা হয়। প্রতিশ্রুতি হয়। প্রেমের গল্প হয় সেই স্ত্রীর সাথে। সেই স্ত্রীর স্বামী নানা কাজে ব্যস্ত থাকতো। সময় দিতো না তাকে।

তাদের ছেলেটি মানবসমুদ্রের দৃশ্য দেখছিলো। খোলামেলা দৃশ্য। স্ত্রী ও যুবক অবৈধ সাক্ষাৎ করতো।

www.pathagar.com

দুই

সেই যুবক প্রতিদিন এই পরিবারকে বাসায় পৌঁছে দিতো। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের সন্তানকে সকালে ও বিকেলে সমুদ্রে নিয়ে যেতো। সবাই একই সাথে সাগরের পানিতে ভিজতো। স্ত্রী সাঁতারে অপরিপক্ব ছিলো। যুবকটি স্ত্রীকে সাঁতার শেখানোর দায়িত্বও নিলো।

স্বামী কাজে ব্যস্ত থাকতো। তার ঘরের দরজা অন্যদের জন্য ছিলো উন্মুক্ত। এই পরিবারে যুবকটির যাতায়াত ছিলো অবাধ, নির্বিঘ্ন। বাঘ যেমন মুক্ত ছাগলকে শিকার করে, যুবকটিও তেমন।

স্ত্রী ও যুবকের মুগ্ধতা দিয়ে শুরু পথচলা। এরপর শারীরিক সম্পর্ক। দেহের আদান-প্রদান। প্রহরী ঘুমালে চোরের চুরি করতে সুবিধা। যৌবনের আগুন পুড়িয়ে দিলো সতিত্ব ও পবিত্রতার পর্দা। স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসতো। অধৈর্য হতো না পেয়ে। এখন নতুন বন্ধু পেয়ে ঘণ্টা-মিনিট হিসেব করতো সাক্ষাতের অপেক্ষায়। যুবকটি পরিকল্পনা করলো– স্ত্রীকে স্বামী থেকে মুক্ত করবে। একান্তে পাবে এই আশায়। পরিকল্পনা আঁটলো যুবকটি।

তিন

যুবকটি স্বামীর কাছে তার আন্তরিকতা প্রকাশ করলো। তার পৌরুষের প্রশংসা করলো। তার যোগ্যতার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করলো। স্ত্রী যুবকের সাহসিকতা ও স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার বিবরণ দিতো। স্বামী যুবকটির প্রতি আস্থাশীল হলো। পরিবারের সকল বিষয়ের চাবি যুবকের হাতে তুলে দিলো।

একদিন স্ত্রী অসুস্থতার ভান করলো। ফ্ল্যাটে সে ও তার সন্তান অবস্থান করলো। স্বামী তার স্ত্রীর কাছে সেই যুবকসহ সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। সকালে। সমুদ্রস্নান করবে।

দুই ঘণ্টা পর। যুবকটি ফিরে এলো স্ত্রীকে খবর দেয়ার জন্য। স্বামী সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে। সলীল সমাধি। বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

সেদিন সকালে সমুদ্র সৈকতে মানুষ ছিলো না। সমুদ্র ছিলো উত্তাল। পাহাড়সম ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছিলো। স্বামী ভালোভাবে সাঁতার পারতো না। যুবকটি তীর থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেলো সাঁতারের জন্য। ঢেউয়ের আহারের জন্য ছেড়ে দিলো তারপর। স্বামী চিৎকার করে আশ্রয়ের আকুতি জানালো। সাড়া দিলো না কেউ। ঢেউ চিরতরে গ্রাস করলো তাকে।

চার

স্ত্রী একা। কেউ নেই তার ভরণপোষণের। যুবকটি তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। একাকী ফ্ল্যাটে মেয়েটিকে কাছে পাওয়ার আশায় মমতা প্রকাশ করলো। নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে। শিশুটির লালন-পালন ও স্নেহ-মমতা দেয়ারও আশ্বাস দিলো। বিয়ে করারও অঙ্গীকার করলো সে।

মেয়েটি যুবকের কাছে অর্পণ করলো নিজেকে। ঠাঁই নিলো যুবকের ফ্ল্যাটে। শিশুটির বয়স ছিলো চার। সে ধারণা করলো, যুবকটি তার পিতা। হৃদয় থেকে সে বলতো বাবা। বাবা।

মেয়েটি বিয়ের জন্য চাপ দিলো। প্রথমে যুবকটি আদরের সাথে টালবাহানা করলো। পরের ধাপে কঠোরতা ও প্রত্যাখ্যান।

কয়েক মাস পর। যুবকটি স্বরূপে ফিরে এলো কৃত্রিম ভালোবাসার ছদ্মাবরণ খুলে। অসন্তোষ প্রকাশ করলো বিধবা ও শিশুটির প্রতি।

যুবকটি এখন অন্য নারীর সন্ধানে। মন তার অন্য নারীর সাথে। এক ফ্ল্যাটে থেকেও তার অনভূতি দূরে। গভীর রাতে ফ্ল্যাটে ফিরতো।

শীতের এক সকাল। যুবকটি নাস্তা খাচ্ছিলো। বিধবা মেয়েটি বিয়ের দাবি জানালো। বিষধর দাঁত বের করলো যুবকটি। আসল চেহারা প্রকাশ করলো। ফ্ল্যাট ছাড়তে বললো তাকে। অন্য মেয়ের সাথে ঘর-সংসারে সে মনস্থির করেছে।

মেয়েটি কান্নাকাটি করলো। অতীতের মধুর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিলো। কিন্তু যুবক বোবা-বধির পাথর হয়ে শুনলো শুধু। শিশুটি অশ্রুর কোনো অর্থ বুঝতো না। ঘটনার কোনো সূত্রও বুঝতো না সে। স্ত্রী কতো স্মৃতি ও প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

www.pathagar.com

শিশুটি রিভলবার নিয়ে খেলছিলো এক কোণায়। যুবকটি অন্য কাজে মগ্ন। সে জানতো রিভলবারে কোনো গুলি নেই। গতরাতে গুলিমুক্ত করে রিভলবার ঘরে রেখেছে যুবকটি। নেশাগ্রস্ত ছিলো। আলো-আঁধারের ফারাক করতে পারছিলো না তখন। মাদকতায় আচ্ছন্ন।

শিশুর হাতের রিভলবার থেকে হঠাৎ একটি গুলি বের হয়ে যুবকের বুকের পাঁজরে বিঁধে গেলো। মুহূর্তে নিথর হয়ে পড়লো সে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে শেষ উক্তি করলো।

গুলির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরাও সমবেত হলো। স্ত্রীকে সে বললো, তোমাকে একান্তে পাওয়ার আশায় তোমার স্বামীকে সাগরে ডুবিয়ে হত্যা করেছি আমি।

ডাক্তার এলো দ্রুত। ততোক্ষণে যুবকের প্রাণবায়ু উড়ে গেছে অন্য জগতে।

এটি ভাগ্যের গুলি। শিশুর হাত থেকে ছুটেছে। অবুঝ শিশুর গুলি তার পাঁজর ভেদ করেছে। তবে শিশু মারেনি। আল্লাহ ছুঁড়েছেন গুলি। অপরাধীর জীবনের পর্দা নেমে গেলো।

গ্রীষ্মের উজ্জ্বল এক সকালে দুর্ভাগ্যজনক একটি মৃত্যু। বিভ্রান্তি ও পরকীয়ার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

ঘাতকের শাস্তি

এক

একজন দরিদ্র সুখী লোক।

পরিবারে দারিদ্র থাকলেও সুখের আবাস ছিলো। প্রশান্তির ছোঁয়া ছিলো পরিবারের সদস্যদের মাঝে। পাঁচ সন্তান, দুই বোন, বৃদ্ধা মা এবং স্বামী স্ত্রী ছিলো এই পরিবারে।

লোকটি শাক-সবজির ব্যবসা করতো। বেগুন, টমেটো, গাজর, কাঁচা মরিচ ও কাঁচামালের ব্যবসা। একটি গলিতে তার দোকান। সবজির দোকান। ছোট্ট দোকান। তার প্রতিবেশী দরিদ্রদের জন্য তার দোকানে কেনাবেচা। টাকার অভাবে শহরে কোনো ভালো জায়গায় সে দোকান দিতে পারে না। পুঁজির অভাবে শাক সবজি ছাড়া কোনো দামী পণ্যসামগ্রীর ব্যবস্থাও করতে পারতো না সে।

একটি ভগ্ন বাসায় তার বসবাস। কুঁড়েঘর। একটিই কামরা। এই কামরায় পরিবারের খাওয়া ও ঘুম। যা আছে তাও এখানে। আবার এরই এক কোণে রান্নার আয়োজন। গোসলও সারতে হয় এখানেই।

এই সবজি-বিক্রেতা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরতো। সাথে অল্প কিছু শাক-সবজি, গোশত-রুটি। পরিবারের সদস্যরা হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানাতো। শিস দিয়ে গান গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতো। তার নিয়ে আসা খাবার মিলেমিশে খেতো এবং রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

ডেকচিতে রান্না হতো সবার জন্য। প্রতিদিন সে গোশত কিনতে পারতো না। ব্যবসায় লাভ হলে গোশত কিনতো। অন্যথায় দোকানের অবশিষ্ট সবজি নিয়ে বাসায় ফিরতো।

সুপ্রিমকোর্টের মাননীয় বিচারকের বাসার কাছেই বসবাস করতো দরিদ্র সুখী পরিবারটি। মাননীয় বিচারক তাদের খোঁজ-খবর নিতেন কখনও কখনও। আর্থিক সাহায্যও করতেন। বিচারক ছিলেন এই পরিবারের প্রতি দানশীল।

বিচারক আমাকে এই সুখী পরিবারের গল্প বলতেন— এদের মত সুখী কোনো পরিবার আমি কোথাও দেখিনি। বিকেলে পরিবারপ্রধান ঘরে ফেরার পর আনন্দ তাদেরকে ঘিরে রাখে। সুখের পায়রা যেন তাদেরকে ঘিরে ওড়া উড়ি করে। লোকটি ঘরে ফেরার পর পরিবারের সদস্যরা এতোটা আনন্দ উল্লাস করতো, আমার মন চাইতো এই সুখের পরিবেশে আমিও কিছুক্ষণ সময় কাটাই। লোকটি ঘরে ফিরে রাতের খাবার তৈরি করতে লেগে যেতো। রান্নার পর একটি বড় প্লেটে খাবার রাখতো। সবাই মিলেমিশে তাতে খাবার খেতো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতো খাবার খেয়ে। কৃতজ্ঞতা জানাতো আল্লাহর নিয়ামতের। খাওয়া দাওয়া শেষে পুরনো চাটাইয়ে শুয়ে পড়তো তারা। আবরণ ঢাকার মতো কাপড় এবং জীবন ধারণ করার পরিমাণ খাবার পেয়ে তারা তুষ্ট হতো। কোনো অশান্তি নেই পরিবারে। নেই কোনো অভিযোগ। সুখের সংসার। হালাল উপার্জন। কষ্টের উপার্জন। কারো কাছে তারা হাত বাড়াতো না।

শরৎকালে এক সন্ধ্যা।

পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষা করছে। ঘরের প্রধান বাসায় ফেরার পর প্রতিদিনের মতো আজও তারা আনন্দ করবে। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কয়েকজন পুলিশ আসছে বাসার দিকে। তারা বহন করছে একটি লাশ।

লাশটি বাবার। লাশটি ভাইয়ের। লাশটি ছেলের। লাশটি বৃদ্ধার সন্তানের। লাশটি স্বামীর। লাশটি পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যবসায়ী দরিদ্র লোকটির।

www.pathagar.com

লোকটি সবজির দোকান বন্ধ করে কসাইয়ের কাছ থেকে গোশত ক্রয় করেছে। রুটির দোকান থেকে কিনেছে রুটিও। সবজির দোকান থেকে কিছু শাক-সবজিও নিয়েছে।

পথের একপাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই দ্রুত গতির একটি গাড়ি তাকে আঘাত করে। গাড়ির চাপায় তার প্রাণবায়ু মুহূর্তেই উঠে যায়। তার নিথর দেহ পড়ে থাকে রাস্তায়। এলোমেলো তার গোশত, রুটি এবং সবজি।

আকস্মিক এ দুর্ঘটনায় পরিবারে শোকের ঝড় বয়ে যায়। সবার চোখে অশ্রু। হতাশা।

প্রতিবেশীরা কিছু টাকা সংগ্রহ করে লাশের দাফন কাফন করলো। লাশ কবরে রেখে প্রতিবেশীরা চলে গেলো। কেউ কেউ কিছু দান খয়রাত করলো। অল্প কিছু টাকা পয়সা।

পরিবারে বড় ছেলেটির বয়স পনেরো বছর। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে। সে পড়ালেখা করছে চাকরির আশায়। পড়া শেষে ছোট একটি চাকরি করবে পরিবারকে সহযোগিতার জন্য।

পিতা মারা যাবার দুদিন পর প্রতিবেশীদের দেওয়া টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেলো। তৃতীয় দিন বড়ছেলে পিতার দোকানে বসলো ব্যবসার উদ্দেশে। মা, ছোট ভাই-বোন, ফুফু ও দাদীসহ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে তাকে দোকানে বসতে হলো।

বিদায় জানালো স্কুলের পড়াশোনা। ছেলেও পিতার মতো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতো। কিন্তু পরিবার থেকে পিতা হারানোর শোকে বিদায় নিয়েছে হাসি। পিতার সাথে আনন্দ উল্লাসও মরে গেছে। আগের মতো খাবারে স্বাদ নেই। খাবারে এখন অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে। সুখও সমাধিস্থ পিতার সাথে।

দুই

সময় বহমান। তিন বছর চলে গেলো। দুর্বিষহের দিন এই পরিবারে ।। সময় বড় কাটতে চায় না। অভাবের সময়। সংকটের মুহূর্ত।

বড়ছেলের বয়স এখন আঠারো বছর। সেনাবাহিনীতে চাকরি পায় বড়ছেলে। দোকান ছেড়ে যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে। পারিবারিক

www.pathagar.com

পরামর্শ হলো। দ্বিতীয় ছেলে স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। এসএসসি পরীক্ষার এক বছর বাকি। পারিবারিক প্রয়োজনে স্কুল ছেড়ে দ্বিতীয় ছেলে মরহুম পিতার দোকানে বসলো। সে দোকান না করলে কীভাবে চলবে সংসার?

পরামর্শ হলো, বাড়িটিও বিক্রি করে দেবে। সংসার পরিচালনার অর্থ নেই। বাড়ি বিক্রি ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঘরহীন জীবন। উদ্বাস্তু জীবন। বড়ছেলে কাছের এক শহরে সেনাবাহীতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলো অস্ত্রের। সেনাবাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলো বড়ছেলে।

সেনা প্রশিক্ষক তার মাঝে অমনযোগিতা লক্ষ করলো। উদাসীন সে। প্রশিক্ষক উপদেশ দিতেন কাজে গুরুত্ব দিতে। কাজে অবহেলার কারণে অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দিতেন।

কিন্তু এই নসিহত এবং অতিরিক্ত কাজ দেয়া নিরর্থক। এইসব তাকে সচেতন করতো না। প্রশিক্ষণে তার মন বসতো না। মন পড়ে থাকতো পরিবারে। পরিবারের স্মৃতি তাকে উদাস করে রাখতো।

ঊর্ধ্বতন অফিসার তাকে ডাকলো। তার সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা খুলে বললো সে। পরিবারের অবস্থা ব্যক্ত করলো। অফিসার তার ব্যথায় সমব্যথী হলো এবং প্রশিক্ষণের কঠোর রীতি-নীতি থেকে তাকে দূরে রাখলো। অন্য কাজে নিয়োগ করলো।

রান্নাঘরে বাসন পরিস্কার করার কাজ দিলো তাকে। সে খাবার তৈরি করতো এবং খানা পরিবেশন করতো।

পরিবারে তাদের আম্মাও উদাসীন। বিপন্ন। বাড়িটি বিক্রি করার জন্য দালালদের কাছে অগ্রিম কিছু টাকা নিয়েছে খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য। জমির দলিল জমা আছে দালালের কাছে। বাড়িটি বিক্রির ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। বাড়ি বিক্রি ঘোষণার বিশ দিন পর চারশত দিনার মূল্যে বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। আরও নয় দিন কেটে যায় নতুন মালিকের কাছে বাড়িটি হস্তান্তর করতে। সরকারি দফতরে কাগজপত্র ঠিক করতে লেগে যায় এই নয় দিন।

www.pathagar.com

শিক্ষানবিস থেকে প্রমোশনের জন্য নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে বড়ছেলেকে। বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে দেওয়া হবে এই ফি। নির্ধারিত সময় একমাস। উনত্রিশ দিন চলে গেছে। মাত্র একটা দিন বাকি।
উনত্রিশ তারিখ বিকেলে। মাকে সতর্ক করতে হবে। বড়ছেলে যে শহরে চাকরি করে সেখানে ত্রিশ তারিখ সকালে যেনো নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে পারে। সময়মতো ফি জমা না দিলে অতিরিক্ত দু বছর থাকতে হবে একই কাজে। ওদিকে নতুন মালিককে বাড়ি হস্তান্তরের জন্য হাতে সময় আছে একদিন।

তিন

মা বাস-স্টেশনে গেলো। ছেলে যে শহরে থাকে সেখানে যাবে। গাড়ি পেলো কিন্তু অন্য যাত্রী নেই সে শহরে যাওয়ার। গ্রীষ্মের বিকেল। মা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করলো। কিন্তু সে শহরে যাবার কাউকে পেলো না। অস্থির হয়ে অপেক্ষার প্রহর কাটালো।
সূর্যাস্ত হলো। দুই শহরের দূরত্ব দুইশত চল্লিশ কি.মি.। আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে পৌঁছাতে। রাতে সফর না করতে পারলে সময়টুকু নষ্ট হবে। পরদিন সকালে গেলে ঝুঁকিতে থাকতে হবে ফি আদায়ে। ফি জমা দিতে হবে সকালেই। মা একাই একটি গাড়ি ভাড়া করলেন। যাত্রী তিনি একাই। পুরো ভাড়া তাকেই পরিশোধ করতে হবে। ড্রাইভার পুরো ভাড়া নিলো।
গাড়ি ছাড়লো বাস স্টেশন থেকে। এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ি পথে গাড়ি চলছে। বাস ড্রাইভার মহিলার সাথে টুকটাক কথা বললো। বাড়ি বিক্রির কথাও শুনলো।
ছেলের ফি পরিশোধ করতে হবে– মহিলার কাছে তাও জানলো। শয়তান ড্রাইভারকে কুমন্ত্রণা দিলো। তার মনে কুমতলব জাগিয়ে দিলো শয়তান। মহিলাকে হত্যা করে তার কাছে রক্ষিত টাকা ছিনিয়ে নেবার ইচ্ছে করলো ড্রাইভার।
যেহেতু গাড়িতে কোনো যাত্রী নেই এবং পথেও কেউ দেখছে না, তাই কাজ বাস্তবায়ন সহজ মনে করলো ড্রাইভার।

www.pathagar.com

গাড়ি গিরিপথ দিয়ে চলছিলো। এক মোড়ে সে গাড়ি থামালো। লোকজন নেই এ জায়গায়। পাশে গভীর খাদ।
হঠাৎ করে গাড়ি থামালো ড্রাইভার। টেনে হিঁচড়ে মহিলাকে বাস থেকে নামালো। বিশ মিটার দূরে খাদের কাছে নিয়ে গেলো।
ছুরি দিয়ে দ্রুত আঘাত করলো সে। লুটিয়ে পড়লো মহিলা। সে ধারণা করলো, মহিলার প্রাণবায়ু উড়ে গেছে। এবার মহিলার ব্যাগ থেকে টাকা ছিনতাই করলো। এরপর মহিলাকে ফেলে রেখে গাড়িতে ফিরে এলো।
আঘাত থেকে রক্তস্রোত বয়ে গেলো। মায়ের শরীর রক্তভেজা হয়ে পড়ে রইলো। ড্রাইভার যে শহরে যাচ্ছিলো গাড়ি সেদিকে চালালো। যে শহর থেকে গাড়ি ছেড়েছে সেখানে ফিরে গেলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। যৌক্তিক সময়ে না ফিরলে নানা প্রশ্ন উঠবে। যাত্রী ছাড়া পূর্বের বাস স্টেশনে ফিরে গেলেও সমস্যা হতে পারে। যে শহরে যাচ্ছিলো গাড়ি যাত্রীহীন হলেও অন্যরা মনে করবে ব্রিজে যাত্রীরা নেমে পড়েছে। স্টেশনে এসেছে খালি গাড়ি। যে শহর থেকে সন্ধ্যায় সে বাস ছেড়েছিলো আবার সে শহরের যাত্রী পেলো। একই পথের যাত্রী।
ড্রাইভার রাতে ফিরছিলো সে পথে। যে স্থানে মহিলাকে আঘাত করেছিলো সেখানে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থামালো। যাত্রীদেরকে বললো, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সে থেমেছে। খাদের কাছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আবার বাসে ফিরবে– বললো যাত্রীদের।
একাকী খাদের কাছে গেলো সে। আঘাতপ্রাপ্ত মহিলা অস্পষ্ট আওয়াজ করছিলো। গোঙ্গানি। মুমূর্ষের ধ্বনি। ড্রাইভার মৃত্যুপথযাত্রী মহিলাকে বললো, অভিশপ্ত মহিলা দেখি এখনও জীবিত!
মহিলা নিথর শরীরে পড়ে আছে। ড্রাইভার তাকে আবার আঘাত করার জন্য বড় আকৃতির একটি পাথর উঠালো হাতে। হঠাৎ বিকট আওয়াজ হলো। সজোরে চিৎকার। যাত্রীরা বাসে বসে আওয়াজ শুনলো। দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে তারা খাদের দিকে পা বাড়ালো। ড্রাইভার যখন পাথর উঠিয়েছে মহিলাকে মারার জন্য। পাথরের নিচ থেকে একটি অজগর সাপ ছোবল দিলো ড্রাইভারকে। বিষাক্ত ছোবল। মহিলা

www.pathagar.com

অস্পষ্ট আওয়াজে সাহায্য প্রার্থণা করছিলো। ড্রাইভার সাপের ছোবল খেয়ে সেখানেই ধরাশায়ী হলো।

বাসের যাত্রীরা ড্রাইভার ও মহিলাকে খাদ থেকে উঠিয়ে পথের মোড়ে আনলো। অন্য গাড়ি আসার অপেক্ষা করছিলো। একটি গাড়ি এলো। লোকজন সেই গাড়িতে ড্রাইভার ও মহিলাকে উঠিয়ে বাস যে শহর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো সে শহরের হাসপাতালে নিয়ে এলো।

এ শহরেই মহিলার বড়ছেলে চাকরি করতো সেনাবাহিনীতে। ড্রাইভার বিষাক্ত ছোবলের আঘাতে পথেই মারা গেলো। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ বহন করে আনা হলো হাসপাতালে। হাসপাতালে তদন্তের জন্য পুলিশ এলো। বিশেষজ্ঞরা এলো। পূর্ণ ঘটনা শুনলো মহিলার জবান থেকে। মহিলার কাছ থেকে ছিনতাইকৃত টাকা পাওয়া গেলো ড্রাইভরের পকেটে। মহিলা তার ছেলেকে খবর দিতে বললো। ছেলে শেষরাতে খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে এলো মায়ের কাছে।

মহিলা মুমূর্ষু ছিলো। ডাক্তার যত্নের সাথে চিকিৎসা করলো। রক্ত পরিবর্তন করলো শরীরের। পরেরদিন সকালে মহিলার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলো। চোখ মেলে তাকালো। কথা বললো ছেলের সাথে।

বললো, তোমার নির্ধারিত ফি দ্রুত পরিশোধ করো। কথা বলেই গভীর নিদ্রায় গেলো। ছেলে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দ্রুত সেনাবাহিনীতে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করলো।

ছেলে ছুটি নিলো চাকরি থেকে। দ্রুত আরোগ্য হলো মা। সুস্থ হয়ে মা হাসপাতাল ত্যাগ করলো কিছুদিন পর।

মহিলাকে ড্রাইভারের আঘাত করা, খাদ থেকে মুক্ত হয়ে হাসপাতালে আরোগ্য লাভ করা, ড্রাইভারকে সাপের ছোবল এবং মৃত্যুর ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। প্রচারিত হলো বিস্ময়ভরা এই ঘটনা।

সেই খাদ যেখানে ড্রাইভার মহিলাকে আঘাত করেছিলো, যেখানে সাপ ড্রাইভারকে ছোবল দিয়েছিলো–মানুষ সে দিকে যেতো না। ভয় করতো। মানুষের বিচরণ কম হওয়ায় সেখানে সাপ, বিচ্ছু ও হিংস্র প্রাণীর অভয়ারণ্য হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

নিশ্চিত মৃত্যু থেকে মহিলা মুক্তি পেতো না যদি ড্রাইভারের কৌতূহল দ্বিতীয়বার তাকে সেখানে নিয়ে না যেতো। এই কৌতূহল হলো ভাগ্য। ভাগ্যই সে খাদে নিয়ে গেছে তাকে।

গভীর রাতে যাত্রীরাও যেতো না যদি ড্রাইভার সাপের ছোবলে চিৎকার না দিতো। যাত্রীরা মহিলা ও ড্রাইভারকে যে শহর থেকে গাড়ি যাত্রা শুরু করেছে সেখানে না এনে গন্তব্যের শহরে নিয়ে গেলে ছেলে যথাসময়ে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে পারতো না। রহস্যের এই ঘটনার সবটুকু আল্লাহর অদৃশ্য কৌশল। বিস্ময়কর কুদরত।

চার

বিচারক। তিনি সেই বিপন্ন পরিবারের প্রতিবেশী। দরিদ্র হলেও পিতা জীবিতকালে সুখ ছিলো এই পরিবারে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ঘরটি বিক্রি করতে হয়েছে।

ঘরহীন দুঃখী পরিবার। বিচারক তার প্রতিবেশী এই পরিবারের ঘটনা সম্পর্কে অন্যদের সঙ্গে বলেন, অন্যান্য মানুষের মতো আমিও শুনলাম ঘটনার বিবরণ। ঘরটি যেনো বিক্রেতা ফিরিয়ে দেয় তাই আমিও টাকা সংগ্রহের কাজে অংশ নিলাম। ঘরের ক্রেতাও শুনলো এই পরিবারের সুখ-দুঃখের গল্প। ক্রেতা সদয় হয়ে ঘরের দলিল ফিরিয়ে দিলো পরিবারের কাছে। ঘরটি সে গ্রহণ করলো না। প্রতিবেশীরা টাকা সংগ্রহ করে নতুন মালিককে টাকা ফেরত দিলো। কিছু টাকায় ঘরটি মেরামত করলো। আবার পিতার সবজির দোকান খুললো ছেলেরা। ক্রেতারা ভীড় করতো এই দোকানে।

মানুষ তাদেরকে সহযোগিতা করলো। এক বছর কাটতেই পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এলো। গলির সবজি দোকান থেকে শহরের চালু বাজারে দোকান দিলো তারা।

কয়েক বছরে এই পরিবার আরও সচ্ছলতার মুখ দেখলো। আর্থিক উন্নতি হলো ধারণাতীত। ছেলেরা স্কুল থেকে পড়া শেষ করে উচ্চশিক্ষার্থে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলো। আরেক ছেলে মেডিকেল কলেজ

www.pathagar.com

থেকে চিকিৎসার উপর ডিগ্রি নিয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হলো। আরেক ছেলে হলো পুলিশ অফিসার।

এখন আগের মতো শুধু রুটি চা বা সবজি খেয়ে রাত কাটাতে হয় না। প্রতিদিন নানা প্রকারের সুস্বাদু খাবার, গোশত, পোলাও ও ফলের আয়োজন হয় পরিবারে। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রাচুর্যের দরজা খুলে দিলেন। তারা অন্যের সুখ-দুঃখে অংশ নিতো। গরিব-দরিদ্র লোকদের আর্থিক সাহায্য করতো। অন্যদের জন্য একটি সুখী পরিবারের উপমা হলো এক সময়ের দরিদ্র পরিবারটি। বাগদাদের দজলা নদীর তীরে এই সুখী পরিবার উন্নতমানের মনোরম বাসা নির্মাণ করে শহরে বসবাস শুরু করলো।

পরিবারের ছেলেরা বিবাহ করলো। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বাড়লো। এক পরিবার থেকে চার পরিবারে রূপ নিলো। সব ছেলে সচ্ছল।

পরিবারের প্রধান হিসেবে সেই মহিলা রইলো। সেই দুঃখী মা-ই হলেন সংসারের প্রধান অভিভাবক।

আমি এই পরিবারের গল্প আমার বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। আমার বিচারক বন্ধু তিনি। আমার ইচ্ছে হলো আমি এই পরিবারের কোনো সদস্যের মুখে সরাসরি শুনবো পরিবারের সুখ-দুঃখের গল্পটি।

বড়ভাই– সে ছিলো সবজি বিক্রেতা। এখন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী। তাকে তার মায়ের গল্পটি বলতে বললাম। সে বললো, কেন আপনি যার ঘটনা তার মুখে শুনবেন না? আমার মায়ের মুখেই শুনবেন এই গল্প।

এক বিকেল। পড়ন্ত বিকেল। নীলের স্বচ্ছ পানিতে সূর্যাস্তের ছবি। লাল ছবি। সূর্যাস্তের পর চাঁদের আলোয় নীলনদে ভাসছি। পালতোলা নৌকা। যাত্রীরা নীলের তীরে ভিড়ছে।

আমি সেই মায়ের কাছে হাজির হলাম নদী তীরের বাসায়। মহিলা মাগরিবের নামাজ আদায় করে জায়নামাজে বসে আছেন। সাদা পোশাকে আচ্ছাদিত। কেশও শুভ্র। মুখে হাসির রেখা। মৃদু হাসি। জিহ্বায় আল্লাহর জিকির।

www.pathagar.com

আমাকে পুরো ঘটনা বললেন তিনি সরাসরি। আমি জানতে চাইলাম, সেই ড্রাইভার যখন আপনাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে একাকী খাদে ফেলে রেখে চলে গেলো তখন কেমন ছিলো আপনার অনুভূতি?

বিশ্বাসদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি তখন একমাত্র আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলাম। ডাকলাম আসমান-জমিনের অধিপতি যিনি। বললাম, তুমিই তো দেখছো আমার দুরবস্থা। আমার বিপদ। তুমিই তো উদ্ধারকারী ইয়া রব!

ইয়া রব, তুমি আমার ছেলের কাছে টাকা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো। তুমিই আমাদের প্রকৃত অভিভাবক। সচ্ছলতা দাও তুমি হে আল্লাহ।

আল্লাহ মহিলার দোআ কবুল করলেন।

সম্পদ ও সন্তান ফিরিয়ে দিলেন। পরিবারের অসচ্ছলতা দূর করলেন। সন্ধান দিলেন সুখের ঠিকানার।

গল্পটি জীবনের। গল্পটি বাস্তব কিন্তু কল্পনাকেও ছাড়িয়ে।

কেউ কেউ বলতে পারে, ঘটনাটি কাকতালীয়।

মানুষ যা ইচ্ছে বলুক কিন্তু আমি পুরো ঘটনায় আল্লাহর বিস্ময়কর কুদরত দেখতে পাই। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহর বিস্ময়কর কুদরত। আল্লাহর সুবিচার। আল্লাহর ইনসাফপূর্ণ বিচার। ঘটনার সব দৃশ্য কাকতালীয়–এটি অসম্ভব। গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহর কুদরত দেখা যায় এই ঘটনায়।

মানুষ উদাস। নিদ্রায়। আল্লাহ সদা জেগে থাকেন এবং পর্যবেক্ষক সব কিছুর। পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিজিকদাতা তিনিই। আঁধার সাগরের গভীরে কালো পাথরের পিঁপড়াকেও তিনি রিজিক পৌঁছে দেন।

তাহলে তিনি কি পিতৃহারা সন্তান, বিধবাকে রিজিক দিতে অক্ষম? তিনি দরিদ্রকে ধনী করতে পারেন না? তিনিই সচ্ছল করেন। তিনিই রিজিক প্রদান করেন। মানুষ মানুষকে ভয় করে। অথচ ভয় করা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। আল্লাহ অবকাশ দেন কিন্তু তিনি বিনিদ্র। সদা জাগ্রত। অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেন। মজলুমের আর্তচিৎকার ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল নেই। নেই কোনো পর্দা। আল্লাহ সরাসরি মজলুমের ডাকে সাড়া দেন।

www.pathagar.com

বিবাদীর শপথ

এক

আদালত প্রাঙ্গন।

একজন লোক মরে গেলো। হঠাৎ মৃত্যু। ইরাকের এক শহরে।

লোকটি একটু আগেই আদালতে বিচারকের সামনে শপথ করছে। বলছে হাজি ইবরাহিম মুহাম্মাদ তাকে কোনো টাকা ঋণ প্রদান করেননি। লোকটির বিরুদ্ধে আদালতে ঋণ পরিশোধে টালবাহানার মামলা ছিলো। হাজি ইবরাহিম মুহাম্মদের কাছ থেকে পনেরোশত দিনার ঋণ নিয়ে পরিশেষে অস্বীকার করছিলো লোকটি। বিচারক কুরআনুল কারিমসহ শপথ করতে বললে সে শপথ করে। শপথে সে বলে, হাজি ইবরাহিম মুহাম্মদ কখনও তাকে কোনো টাকা ঋণ প্রদান করেননি। শপথ আল্লাহর। আদালত প্রাঙ্গনে এই ঘটনা ঘটেছিলো ১৯৫৪ সালে।

দুই

হাজি ইবরাহিম মুহাম্মদ ইরাকের শীর্ষ ব্যবসায়ী। দানশীল। কোনো ভিক্ষুককে তিনি ফিরিয়ে দেন না খালি হাতে। কোনো প্রত্যাশীকে তিনি বঞ্চিত করেন না।

দাজলা নদীর তীরে ছিলো হাজির অফিস।

www.pathagar.com

একজন লোক এসে নিজের অভাবের কথা বললো। দারিদ্রের বিবরণ দিয়ে সাহায্য চাইলো। লোকটি হাজি ইবরাহিমকে বললো, আমি আপনার প্রতিবেশী। আমার আব্বা আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। তিনি মারা যাবার সময় আমাকে অসিয়ত করেছেন, বিপদে যেনো আমি আপনার কাছে আমার সমস্যার কথা বলি। আপনার সমীপে যেনো আবেদন করি।

এ বছর ক্ষেতে ভালো ফসল হয়নি। ভূমি অনুর্বর এ বছর। বৃষ্টিও হয়নি। আমি কিভাবে সারাটা বছর কাটাবো বুঝতে পারছি না। ব্যাংক থেকে আমি ঋণ করেছি। দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে মামলা হবে। আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। পনেরোশত দিনার আমাকে ঋণ হিসেবে দেবেন আপনি? ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করবো এবং বীজ কিনবো নতুন ফসলের। আগামী বছর ফসল কাটার সময় আপনার কাছ থেকে গ্রহণকৃত ঋণ আমি যথাসময়ে পরিশোধ করবো।

হাজি ইবরাহিম রক্ষিত ক্যাশবাক্স থেকে পনেরোশত দিনার ঋণ হিসেবে লোকটিকে দিলেন। হিসেবের খাতায় লিখেও রাখলেন। লোকটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো এবং চুক্তিপত্র করার তাকিদ দিলো। হাজি ইবরাহিম বললেন, তোমার মনে ও আমার মনে আল্লাহই সাক্ষী। তিনি সব দেখছেন। কৃতজ্ঞতারও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ সবকিছুর জিম্মাদার। তিনি পর্যবেক্ষক। ঋণ প্রদানের এক বছরের মাথায় হাজি ইবরাহিম দুনিয়া ছেড়ে ওপারে চলে যায়। রেখে যায় তার স্ত্রী ও চার সন্তান। বড় সন্তানের বয়স মাত্র তেরো বছর।

তিন

হাজি ইবরাহিমের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী স্বামীর ব্যবসায়িক দলিল দস্তাবেজ ও হিসাবের খাতাগুলো নিরীক্ষণ করলো। এ ব্যাপারে তার উকিলভাই সহযোগিতা করলো। হাজির কাছ থেকে ঋণগ্রহীদের একটি তালিকা করা হলো।

স্বামী মারা যাওয়ার কয়েক মাস পর তার স্ত্রী পনেরোশত দিনারের ঋণগ্রহীতার কাছে লোক পাঠালো টাকা পরিশোধের জন্য। লোকটি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো। বললো সে ঋণ নিয়েছিলো কিন্তু যথাসময়ে হাজি ইবরাহিমের হাতেই টাকা পরিশোধ করেছে। হয়তো তিনি পরিশোধের কথাটা লিখে রাখেননি।

ঋণ পরিশোধ করা না করার বিষয়টি অন্য লোকজনও শুনলো। কেউ কেউ মনে করলো যে, হয়তো সে পরিশোধ করেছে অন্যথা হাজি ইবরাহিম রেজিস্টার খাতায় ঋণের কথা চূড়ান্তভাবে লিখতে ভুলে যান। কিছু লোক মনে করলো, হাজি ইবরাহিম ছিলেন সরল ও সৎলোক। দানশীল। তিনি সরল বিশ্বাসের কারণে ঋণ প্রদান করেও লিখে রাখেননি।

মহল্লার প্রভাবশালী লোকদের সহযোগিতা কামনা করলো হাজির স্ত্রী। যেনো ঋণগ্রহীতা ঋণের কথা স্বীকার করে এবং টাকা পরিশোধ করে। কিন্তু লোকটি কাউকে মানলো না। অহংকার করে অস্বীকার করলো বারবার।

চার

অমীমাংসিত ঘটনা। অবশেষে হাজির স্ত্রী তার উকিলভাইয়ের সহযোগিতায় মামলা করলো। আদালতে শুনানির দিন নির্ধারণ করা হলো। বাদী-বিবাদী হাজির হলো আদালতে। আমি বিচারকের জবানিতেই গল্পটা বলছি।

বিচারক বলেন, আমি বাদী-বিবাদীর সব কথা শুনলাম। আমার ধারণা হলো, লোকটি হাজি ইবরাহিমের ঋণ পরিশোধ করেনি। কিন্তু পনেরো শত টাকার অংক খসড়া খাতায় শুধু লেখা। কোনো চুক্তিপত্র বা দস্তখত না থাকায় অভিযুক্তের বিচার করা যাচ্ছে না। খসড়া খাতায় লেখাটি শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া অন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছুই নেই বিবাদীর বিরুদ্ধে।

বিবাদীও স্বীকার করছে যে, হাজি ইবরাহিমের কাছ থেকে এই পরিমাণ টাকা গ্রহণ করে যথাসময়ে পরিশোধ করে দিয়েছে। একজন সাক্ষ্য দিলো, লোকটি একবার হাজি ইবরাহিমের প্রশংসা করে বলেছে সে তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে। কিন্তু কতো নিয়েছে তা বলেনি।

www.pathagar.com

মামলার বিষয়টি জটিল মনে হলো। আমি বিবাদীরকাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ও অনাদায়ের বিষয়ে স্বীকারোক্তি নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করলো না। অবশেষে আইন অনুযায়ী আমি তাকে শপথ করতে বললাম।

আমি বললাম, তুমি কি কুরআনুল কারিমসহ শপথ করে বলতে পারবে? তুমি হাজি ইবরাহিম মুহাম্মদের থেকে ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ করেছো? লোকটি বললো, কসম আল্লাহর। আমি ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি।

শপথ শোনার পর আমি তাকে আদালতের শাস্তি থেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম। অভিযুক্ত বিবাদী অহংকের মাথা উঁচু করে আদালতের কাঠগড়া থেকে বের হলো। সে ছিলো সুঠামদেহী। সুসাস্থ্য যৌবনের অধিকারী।

সে আদালত প্রাঙ্গনে বের হতেই আমি মানুষের হৈচৈ শুনতে পেলাম। কোলাহল। হট্টগোল। বিষয়টা জানার জন্য আমি উঁকি দিলাম। আমি কেঁপে উঠলাম। যে লোকটি আমার সামনে কিছুক্ষণ আগে কসম করে আদালত থেকে বের হলো সে চিৎপটাং হয়ে আদালত প্রাঙ্গনে পড়ে আছে। চোখ বড় বড়। জিহ্বা বের হয়ে আছে। শরীর হলুদ বর্ণের। যেনো একটি প্রকাণ্ড গাছ শেকড়সহ উপড়ে পড়ে আছে।

মানুষ চিৎকার করে বললো, সে মরে গেছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

পাঁচ

হাজি ইবরাহিম মুহাম্মদের স্ত্রী আমার বাসার কাছেই বাস করতো। আমার পরিবারের সাথেও ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি সেই মহিলার কাছে ঘটনাটি জানতে আগ্রহী হলাম। সে বললো, আমার স্বামী হাজি ইবরাহিম প্রতিবেশীদের প্রতি দানশীল ছিলেন। পরিচিত অপরিচিত অনেককে তিনি আর্থিক সাহায্য করতেন। অভাবীদের দান করতেন। কেউ ঋণ চাইলে তাও দিতেন। তিনি ঋণের কথা কখনও খসড়া খাতায় কখনও রেজিস্টার খাতায় লিখে সংরক্ষণ করতেন।

www.pathagar.com

আমি এই উদারতা ও দানশীলতা নিয়ে কোনো কথা বললে তিনি বলতেন, সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ। আমার কাছে তা আমানত। আমি জীবনের এক পর্বে দরিদ্র ছিলাম। ছিলাম নিঃস্ব। অভাবী। পিতৃহারা এতিম। আল্লাহ আমাকে ধনী করেছেন। ভালো ঠিকানা দিয়েছেন।

আমি কোনো এতিমকে ধমক দেই না। কোনো ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেই না। তিনি কথা শেষ করলেন। আমি যদি আরও দান করতে পারতাম! আরও ঋণ দিতে পারতাম!

আমি আদালতে লোকটির কথা গভীর মনোযোগে শুনেছি। সে মিথ্যা শপথ করেছে। আমি মনে মনে বলেছি, আল্লাহ সবকিছু শোনেন। দেখেন সবকিছু। আদালতে বিচারক তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করেন। সে মিথ্যা কসম করে দুনিয়ার শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমির বিশ্বাস ছিল যে, সে শাস্তি পাবেই। কারণ সে মিথ্যা শপথ করছে। সে আল্লাহর কালাম হাতে নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

আমি আল্লাহর দরবারে বলেছি, হে আল্লাহ! তুমি প্রকাশ্য-গোপনীয় সব জানো। তুমি অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী। তুমি এই মিথ্যা শপথকারীকে দৃষ্টান্ত বানাও। হে শক্তিধর, হে প্রতাপশালী আল্লাহ।

অভিযুক্ত লোকটা শপথ শেষে আদালত থেকে বের হলো। আমি দেখলাম সে দৃশ্য। আদালতের বারান্দা পেরিয়ে আঙ্গিনায় আসতেই সে মাটিতে পড়ে গেলো ধপাস করে।

দুনিয়ার আদালতের শুনানি থেকে বেঁচে গেলেও মুক্তি পেলো না আসমান-জমিনের মালিকের সুবিচারের আদালত থেকে। এই দ্বন্দ্ব তার ও হাজি ইবরাহিম মুহাম্মদের মাঝে ছিলো না। এই দ্বন্দ্ব ছিলো আসমান-জমিনের অধিপতি আল্লাহর সাথে। সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর আদালত থেকে মুক্তি পেলো না।

ছয়

কনকনে শীতের রাত। দুর্বিষহ শীত। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। মানুষ ঘর থেকে বাইরে বের হচ্ছে না শীতের কারণে। মরহুম হাজি

ইবরাহিমের ঘরের দরজায় মধ্যরাতে আওয়াজ করছে কেউ। বিরতিহীন দরজায় আওয়াজ দিচ্ছে। শীত ও বৃষ্টিভেজা রাতে। দরজায় এক মহিলা দাঁড়িয়ে। ভীত। তার সাথে ছয় বছরের এক শিশু। ঘরের দরজা খুলে গেলো। আগন্তুক সেই মিথ্যা শপথকারীর স্ত্রী। সাথে তার একমাত্র ছেলে। ছয় বছরের শিশু।

সেই মহিলা বললো, আমি আমার ঋণগ্রহীতা স্বামীকে বারবার বলেছি, তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিও না। আমি জানতাম সে হাজি ইবরাহিমের কাছ থেকে টাকা ঋণ করে পরিশোধ করেনি। সে মিথ্যা বলেছে।

ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিতো। আদালতেও সে মিথ্যা শপথ করেছে। মিথ্যার বদলা দ্রুত পেয়েছে। তার পরিণাম আদালত প্রাঙ্গনে অপমৃত্যু।

আমি সেই ঋণের পনেরোশত দিনার নিয়ে এসেছি। আপনি তা গ্রহণ করে আমাদের বাধিত করুন। মুক্ত করুন ঋণের বোঝা থেকে। একথা বলেই সে হাজি ইবরাহিমের স্ত্রীর কাছে টাকার থলে দিলো এবং দ্রুত বাড়ির বের হয়ে চলে গেলো। হাজির স্ত্রীর কোনো কথাই সে শুনলো না।

অন্ধকারে মহিলা হারিয়ে গেলো এবং তার সাথে শিশুটিও। হতভম্ব হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো মরহুম হাজি ইবরাহিম মুহাম্মদের বিধবা স্ত্রী। দেখলো দুটি ছায়া দ্রুত মিলিয়ে গেলো। আঁধারে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

বাইরে বৃষ্টি ও হাওয়ার মাতামাতি।

সাত

আমার স্মরণ হলো নবিজির বিখ্যাত সাহাবি হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. বলেন, জামাল যুদ্ধের সময় আমার আব্বা জুবাইর আমাকে ঋণ পরিশোধের অসিয়ত করলেন।

তিনি বললেন, তুমি যদি আমার পাওনাদারদের টাকা পরিশোধে অপারগ হও তাহলে আমার মাওলা ও আমার মালিকের সাহায্য কামনা করবে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি মাওলা ও মালিক বলতে কাকে বুঝিয়েছেন আমি তা উপলব্ধি করতে পারিনি। তাই বললাম, আব্বা, আপনার মাওলা ও মালিক কে? তিনি বললেন, শপথ আল্লাহর, যখনই ঋণ সংক্রান্ত গভীর বিপদে পড়েছি তখনই বলেছি– হে জুবাইরের মাওলা, তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিন। তিনি দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার ঋণের ধরণ ছিলো, লোকজন তার কাছে মাল আমানতের জন্য নিয়ে আসতো।

তিনি বলতেন, না। আমাকে ঋণ হিসেবে দাও। আমানত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর বলেন, আমি আব্বার ঋণ হিসাবে লাখ লাখ টাকা পরিশোধের দায়িত্ব পেলাম। আব্বা শহিদ হলেন কিন্তু কোনো দিনার ও দিরহাম রেখে গেলেন না। শুধু দুই খণ্ড জমি। আমি সে জমি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করলাম।

জুবাইরের অন্য সন্তানগণ বললো, আমাদের মিরাছ? বললাম, চার বছর মিরাছ বণ্টন হবে না। ফসলের মৌসুমে ঋণ পরিশোধের ঘোষণা করতাম। পাওনাদার যেনো তার প্রাপ্য গ্রহণ করে। চার বছর পর সম্পূর্ণরূপে ঋণ পরিশোধ হলো। এরপর মিরাছ বণ্টন হলো সন্তানদের মাঝে।

জুবাইরের মাওলা আল্লাহ তাআলা জুবাইরের সকল ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করেননি।

আল্লাহ হলেন সবারই মাওলা। শুধু হজরত জুবাইর রা. জন্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে না। গভীর সমুদ্রের তলদেশে কালো পাথরের কালো পিঁপড়াকেও আল্লাহ ভুলে থাকেন না। অভাবনীয়ভাবে তার রিজিক পৌঁছান। আল্লাহ সবারই রিজিকদকাতা। হালাল ও হারাম রিজিকের মাঝে অনেক পার্থক্য। **আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হলো প্রকৃত কল্যাণের পথ। বরকত ও প্রাচুর্যের পথ। সৌভাগ্যের পথ।**

www.pathagar.com

হজরত জুবাইর রা.-এর বিশ্বাস ও আস্থার অংশবিশেষ, অকালেও আল্লাহ সকল ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। বিদূরিত করবেন সকল সমস্যা। সকল কঠিনকে তিনি সহজ করে দেবেন। আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা রাখলে তিনি আসমান ও জমিনের সকল বরকতের দরজা খুলে দেন। পথ একটিই। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

www.pathagar.com

ভাগ্য কথা বলে

এক

পাহাড়ের পাদদেশে।

ইরাকের উত্তরে। ছবির মতো একটি গ্রাম। মনোরম। প্রাকৃতিক শোভায় সাজানো। পাহাড়ি এলাকায় বরফাচ্ছাদিত ঘরবাড়ি। ঝরণায় স্বচ্ছ, সুপেয় পানি। বিস্তীর্ণ উদ্যান। ফল ও ফুলের বাগান। সবুজ শ্যামল। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। অপরূপ একটি গ্রাম। এই গ্রামে বাস করতো এক প্রভাবশালী মোড়ল।

দুই

সুআদ।

রূপসী একটি মেয়ে। লাবণ্যময় চেহারা। হরিণী চোখ। মায়াকাড়া মুখ। মেয়েটির রূপ গ্রাম ছাড়িয়ে পাশের গ্রামেও আলোচিত। লাল পাড়ের জরিন জামায় যখন বের হয় তখন তাক করে চেয়ে থাকে অন্যের চোখ। ধাঁধায় ফেলে তার রূপ। ফুলের মতো রূপসী কন্যা সুআদের বিয়ে হয়েছে তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে। রূপসী মেয়েটি পাহাড়ি ঝরণা থেকে স্বচ্ছ পানি বহন করে নিয়ে যেতো। পানিভার্তি কলসী নিয়ে পাহাড়ি পথে আসা-যাওয়া করতো। সুপেয় পানি নিয়ে যেতো বাসায়।

www.pathagar.com

মেয়েটি তার স্বামীর কৃষি কাজেও সহযোগী ছিলো। বীজ বপন করতো। ফল উঠাতো। ফল ও ফসলের আহরণে সে কৃষিভূমিতে যাতায়াত করতো। গ্রাম্য সেই মোড়লটি উন্মাদ ছিলো মেয়েটির রূপ-লাবণ্যে। পাগলপ্রায়। মেয়েটির চলার পথে উদাস হয়ে চেয়ে থাকতো। মোড়ল একদিন মেয়েটিকে চলার পথে প্রেম নিবেদন করে বসলো। লোভ দেখালো। প্রলুব্ধ করলো। কিন্তু মেয়েটি তার প্রেমের আবেদন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। তবে এই ঘটনার কথা স্বামী বা পরিবারের কাউকে জানালো না লজ্জায়। ভয়ে।

তিন

মোড়ল রূপসীর প্রেমে অন্ধ হয়ে গেলো। নিজের অবৈধ লালসা বাস্তবায়নের উপায় খুঁজতে লাগলো। মেয়েটির স্বামী বসন্তের শেষ দিনগুলো এবং গ্রীষ্মের শুরুতে ক্ষেতে ফসল কাটতে যেতো। সারাবেলা কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকতো সে এই সময়ে। ফসল উঠানোর কিছু কাজ বাকি ছিলো। সাধ্যাতীত কষ্ট করতো সে। সন্ধ্যার অন্ধকারেও ফসলের কাজে পরিশ্রম করতো।

ঘরে তার প্রিয়তমা স্ত্রী রান্নার আয়োজন করতো। কৃষিকাজে সহযোগী স্ত্রীকে সন্ধ্যার আগেই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতো লোকটি। সারাদিন থাকতো সে স্বামীর সাথেই। সন্ধ্যায় ফসলের আটি বহন করতো উঠোনে। পরস্পরে অনুভব করতো একে অপরের কষ্ট। ভালোবাসার সুদৃঢ় বন্ধন ছিলো দু'জনের মাঝে।

স্বামীর ঘরে ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনতো স্ত্রী। থাকতো উদ্বিগ্ন। স্বামীও কাজ শেষে স্ত্রীর পরশে আসার জন্য ব্যাকুল থাকতো। খাবার প্রস্তুত থাকতো। স্ত্রী ঘরের বারান্দায় স্বামীর পথপানে চেয়ে থাকতো।

একদিন

প্রেমিক মোড়ল ওঁৎ পেতে রইলো পথে। স্বামীর ফেরার পথে। গোপনে বসে থাকলো একটি বড় পাথড়ের আড়ালে। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পর পথে স্বামীকে একাকী পেলো মোড়ল। রিভলবার থেকে দ্রুত একটি গুলি ছুঁড়লো তাকে লক্ষ করে। হত্যার নেশায় মাতাল হয়ে। গুলিবিদ্ধ

www.pathagar.com

হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো এক গর্তে। হত্যাকারী মোড়ল রাতের আঁধারে পলিয়ে গেলো।

স্ত্রী অনেক রাত পযর্ন্ত অপেক্ষা করলো স্বামীর জন্য। কিন্তু সে ফিরলো না। স্ত্রী পরিবারকে এই খবর জানালো। পরিবারের লোকজন দ্রুত ফসলের ক্ষেতে গেলো। শূন্য ক্ষেত। পথে দেখতে পেলো স্বামীর লাশ। রক্তাক্ত দেহ। নিথর। রক্তস্নাত।

চার

সুখী পরিবারে দুঃখের অমানিশা নেমে এলো। পরিবার থেকে বিদায় নিলো হাসি-আনন্দ। বিনোদন। শোকার্ত পরিবার। স্ত্রী বৈধব্যের বেশ ধারণ করলো। শুরু হলো দুঃখের দিন। স্বামী হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশের তদন্ত কমিটি মাঠে নামলো। সংশ্লিষ্ট সবাই হত্যারহস্য বের করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করলো। মোটা ফাইল তৈরি হলো নানা জিজ্ঞাসাবাদের। নানা প্রকারের ফাইল। ঘটনার কূল-কিনারার হদিস না পেয়ে তদন্ত ফাইলে লিখে রাখা হলো– হত্যাকারী অজ্ঞাত। গভীর তদন্ত করেও হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হলো না। অপরাধী অজ্ঞাতই রয়ে গেলো।

বাস্তবেই হত্যার ঘটনাটা ছিলো জটিল রহস্যঘেরা। নিহতব্যক্তির প্রকাশ্য কোনো শত্রু ছিলো না। পরিবার কাউকে হত্যার ব্যাপারে সন্দেহও করছে না। হত্যাকাণ্ড হয়েছে রাতের নিকষ আঁধারে। হত্যাকারী হত্যার কোনো ছাপ রেখে যায়নি। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে হত্যার কয়েক ঘণ্টা পরে। হত্যার স্থানও জনপদ থেকে দূরে। মানুষ ধারণা করলো হত্যাকারী চিরদিনের জন্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলো।

কিন্তু ঘটনার পর ঘটনা থাকে। আল্লাহ তাআলা ছিলেন এই ঘটনার পর্যবেক্ষণে। তিনি সর্বদ্রষ্টা। মানুষ কোনো একটা ধারণা করে বসে থাকে। আল্লাহ কাজ সম্পাদনা করেন সব ধারণার বাইরে। আল্লাহর শক্তিই বড় শক্তি।

www.pathagar.com

পাঁচ

স্বামী হত্যার কয়েক মাস পর সেই রূপসী মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠলো। প্রতিযোগিতা শুরু হলো কে তাকে বিয়ে করবে। প্রতিযোগীদের একজন গ্রামের মোড়লও। নানা লোভ, প্রলোভন, ধমকি, শক্তি প্রয়োগ করে মোড়ল মেয়েটিকে বিয়ে করতে সফল হলো।

শুরু হলো মোড়ল ও সেই মেয়ের সংসার। কিন্তু মেয়েটির ভাবনা ও স্মৃতিতে কেবল আগের স্বামীই ছিল। সেই চাচাতো ভাইয়ের স্মৃতি তাকে কাঁদায়। দ্বিতীয় স্বামী ছিলো ধনাঢ্য। সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের অধিকারী। মেয়েরটির আদর যত্নের কোনো অভাব নেই। কিন্তু কোনো আদর আপ্যায়নই প্রথম স্বামীর কথা ভোলাতে পারে না।

দ্বিতীয় স্বামীর সাথে মেয়েটির বাহ্যিক সম্পর্ক হলেও প্রথম স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিলো প্রাণের গহীনের। ভালোবাসার। জগতের কোনো সম্পদই ভালোবাসার বিনিময় হতে পারে না। প্রথম স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা ছিলো অকৃত্রিম। সম্পদ এই ভালোবাসায় মুখ্য নয়। আগের দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ছিলো উভয় পক্ষের। দ্বিতীয় বিয়েতে ভালোবাসা শুধু একতরফা। স্বামীর পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয় স্বামী এক রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেলো। কাছের গ্রামেই তার বাড়ি। রাতের প্রথম প্রহর কেটে গেলো বন্ধুর বাড়িতে। আপ্যায়নে কেটে গেলো। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে মোড়ল বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিলো। ফেরার পথে হঠাৎ এক পাহাড়ের পাদদেশে গুলির আওয়াজ শুনলো। সহযোগিতার জন্য আর্তচিৎকার। মৃত্যুর গোঙ্গানি। মোড়ল সাথে থাকা রিভলবার বের করলো। আত্মরক্ষার স্বার্থে। পাশের একটি গর্তে আশ্রয় নিলো। গুলি বন্ধ হলে সে বাড়ির পথ ধরবে। পাশের গ্রামের লোকজন ছুটে এলো কোলাহল ও গুলির শব্দ শুনে। এলো পুলিশের দল। দেখলো কয়েকটি লাশের পাশে রিভলবার হাতে সেই মোড়ল। চারপাশে রক্ত ও লাশ।

পুলিশ মোড়লকে হত্যা ও ছিনতাইয়ের সন্দেহে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো থানায়। আশপাশের সবকিছুই প্রমাণ বহন করে মোড়লই

www.pathagar.com

হত্যাকারী। গর্তে লাশের সাথে পাওয়া গিয়েছে তাকে। তার কাপড়েও রক্তের দাগ। ছাপ। তার হাতে থাকা রিভলবারের গুলিও নিহতদের শরীরের বিদ্ধ গুলির অনুরূপ। মেডিকেল রিপোর্টও তাই দিয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় হলো, মোড়লকে ধরা হলো সেই গর্ত থেকে যে গর্তে সে মেয়েটির স্বামীকে হত্যা করে লুকিয়ে রেখেছিলো।

ছয়

মোড়লকে উচ্চ আদালতে নেয়া হলো সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে। ফাঁসির হুকুম ঘোষণা করলো আদালত। আদালতের ফাঁসির রায় কার্যকর করার দিন শেষবারের মতো দেখা করতে এলো তার পরিবারের সদস্যরা। এলো মেয়েটিও। মোড়ল তার স্ত্রীর সাথে একান্তে কথা বলার অনুমতি নিলো।

চুপিচুপি মোড়ল স্ত্রীকে কিছু কথা বললো, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়লো। স্ত্রী তার কথা শুনে মূর্তির মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো। মুখে কথা নেই, চোখে পানিও নেই স্ত্রীর। জেল প্রহরীরা পরিবারের সদস্যদেরকে জেলখানা থেকে সরে যেতে বললো।

মোড়লকে ফাঁসির মঞ্চে রেখে সবাই চলে এলো। মেয়েটির মুখে কোনো শব্দ নেই। নীরব। তার এই নীরবতা কান্নার চেয়েও করুণ।

ফাঁসি কার্যকর করার পর লাশ দাফন করা হলো। স্ত্রীর নতুন শোক শুরু হলো। সন্তানসহ নিজ বাড়িতে ফিরে এলো। মোড়লের বাড়িতে শোকপালনে সে অস্বীকৃতি জানালো। অনেক তাকিদ ও চাপ দেবার পরও সে থাকলো না দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে। শোকপালনের দিনগুলোতেও।

মোড়লের পিতা এলো তার নাতিনকে নিয়ে যাবার জন্য। চাপ দিলো স্ত্রীকে। স্ত্রী চুপিসারে শ্বশুরকে বললো, আপনার ছেলে আমার প্রথম স্বামীর হত্যাকারী। জেলখানায় আমরা যখন স্বপরিবারে শেষবারের মতো দেখতে গেলাম তখন সে আমাকে ডেকে একান্তে সব ঘটনা স্বীকার করেছে।

সে বলেছে–

www.pathagar.com

আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। তোমার স্বামীকে আমিই হত্যা করেছি। শুধু তোমাকে একান্তে পাওয়ার আশায়। আমি সেই লোককে হত্যা করিনি যার অভিযোগে আমাকে ফাঁসির ঘোষণা করেছে আদালত। কিন্তু আল্লাহ ছিলেন আমার অপরাধের পর্যবেক্ষণে। কিছুদিন পর তোমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি।

নিশ্চুপ পিতা। স্ত্রীও নীরব। কথা বললো ভাগ্য। ভাগ্য কথা বলে।

www.pathagar.com

ভাগ্য প্রহরী

এক

টাওয়ার।

মুসেল শহরের উঁচু টাওয়ারে একটি বালক উঠলো। চুপিসারে একাকী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো। মুসেলে এটি ছিলো সর্বোচ্চ টাওয়ার। ঐতিহ্যের মিনারা।

টাওয়ারের প্রাচীর থেকে উঁকি দিলো বালক নিচের দিকে। পা পিছলে গেলো। পদস্খলন। ধপাস করে সে নিচে পড়ে গেলো। নিচে ছিলো চায়ের দোকান। দোকানের টেবিলে হঠাৎ সজোরে আওয়াজ শুনলো দোকানদার। দোকানি কী ঘটেছে তা দেখতে গিয়ে বিস্মৃত, একটি বালক উঁচু টাওয়ার থেকে নিচে পড়েছে।

কী সর্বনাশ!

বালক দ্রুত দৌড় দিলো দোকানদারের ভয়ে। বললো, চাচা আমার দোষ নেই। আমি ইচ্ছা করে উঁচু টাওয়ার থেকে পড়ে যাইনি!

এত উঁচু থেকে পড়লেও শিশুটির কোনো ক্ষতি হলো না। এরপর ৬০ বছর দুনিয়ায় বেঁচে থাকলো সে। স্বাভাবিকভাবেই জীবন-যাপন করলো। হঠাৎ একদিন ঘরের মেঝেতে পা পিছলে পড়ে গেলো। এই আঘাতেই তার মৃত্যু হলো।

কী বিস্ময়!

www.pathagar.com

দুই

একদিন পাহাড়িপথে গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম। সেনাবাহিনীর ছোট গাড়ি। এবড়ো থেবড়ো পথ। আমি ভাবছিলাম জীবন ও জগৎ নিয়ে। চালকের আসনে বসে এই ভাবনা। গিরিপথ দিয়ে চলছিলো গাড়ি। পাশে গভীর খাদ। হঠাৎ গাড়ি একটি গর্তে ঢুকে পড়লো। গাড়ির সামনের অংশ সেই গর্তে পড়ে আটকে গেলো। আরেকটু ঝুঁকলে গভীর খাদে পড়তো গাড়ি। কয়েকজন দ্রুত আমাদের কাছে এলো আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য। তারা বিস্মিত হলো নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসার কারণে। গর্তটি গাড়িকে আটকে না রাখলে গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। এই গর্তের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন।

কতো কুদরত আল্লাহ্‌র!

১৯৫২ সাল।

পাহাড়ি অঞ্চল রান্দুজ। গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম আমি। এলোমেলো, আঁকাবাঁকা পথ। পথের বামে উঁচু পাহাড়। ডানে গভীর গিরিখাদ। হঠাৎ গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারালো। ব্রেক কাজ করছিলো না। লাগামহীন উন্মাদ গতিতে গাড়ি ছুটে চললো। আমরা ভাগ্য সঁপে দিলাম আল্লাহ্‌র কাছে। মৃত্যুর প্রহর গুনছি।

হঠাৎ একটি বড় গাছের সাথে ধাক্কা খেলো গাড়ি। থেমে গেলো গতি। আমরা দ্রুত বের হলাম গাড়ির ভেতর থেকে। আলহামদুলিল্লাহ্ পড়লাম। প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনিই এক উপায়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন। বিশ্বাসই হচ্ছিলো না আমরা বেঁচে থাকবো! নিশ্চিত ভেবেছিলাম আমাদের মৃত্যু। আল্লাহ্ই প্রাণের রক্ষক।

তিন

১৯৪৮ সাল।

তখন আমি জানিন শহরে। আর্মি অফিসার। ইরাকের সামরিক ইউনিটের প্রধান আমি। সীমান্ত এলাকায় জাতিসংঘের শান্তি মিশনের

www.pathagar.com

শান্তিরক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলাম। সীমান্তে কোনো ঘটনা ঘটলে আমরা সেগুলোর খোঁজ নিতাম। পাহাড়ি এলাকায় একবার গেলাম। শান্তিরক্ষাবাহিনীর তিন অফিসার ও আমি। উম্মে ফাহাম অঞ্চলে আমাদের মিশন। এই এলাকার পথ ছিলো আঁকাবাঁকা এবং উঁচুনিচু।

আমরা সীমান্তে যায়নবাদী ইহুদিদের সীমানার কাছাকাছি গেলাম। শান্তিরক্ষা প্রতিনিধিদেরকে আমি বোমা আক্রমণ সম্পর্কে সর্তক করলাম। বললাম আমি, আমরা যদি সীমান্তরেখা অতিক্রম করি তাহলে ইহুদিরা বোমা নিক্ষেপ করবে। গুলি ছুঁড়বে। তাদের একজন বললো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা জার্মান বাহিনীর বোমাকেও তোয়াক্কা করিনি। আজ কি ইহুদিদের বোমা হামলাকে ভয় করবো? তাছাড়া আমরা তোমাদের এই অঞ্চলে আগমনের খবরও জানিয়েছি তাদেরকে। তারা আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। ইহুদিরা বোমা ছুঁড়তেই পারে না, সম্ভাবনাও নেই।

আমি বললাম, যায়নবাদীদের কোনো সভ্যতা-ভদ্রতা নেই। অমানবিক তারা। নিষ্ঠুর। নিশ্চিত তারা আমাদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়বে। আমাদের হত্যা করতে পারলে তারা এটাকে তাদের বিজয় বা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে মনে করবে। হত্যার পর শান্তিরক্ষাবাহিনীকে ডেকে বলবে, বোমা নিক্ষেপ ভুলে হয়েছে। আমরা তদন্ত কমিটি গঠন করবো। এরপর তারা কিছুই করবে না।

শান্তিরক্ষাবাহিনী বাধা অমান্য করে সীমান্ত পাড়ি দেবেই। অটল তাদের সিদ্ধান্তে। আমার মনে হলো, তারা ইরাকি সেনা ইউনিটকে কাপুরুষতার অপবাদ দেবে। এই অপবাদের চেয়ে মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিলাম।

আমিও সীমান্ত পাড়ি দেবার প্রস্তুতি নিলাম তাদের সাথে। যায়নবাদী ইহুদিসেনারা অতর্কিত সীমান্তে বোমা নিক্ষেপ শুরু করলো। শান্তিরক্ষাবাহিনী মাটিতে শুয়ে পড়লো। মাথা নিচু করে ক্রলিং করলো। আমি সীমান্তের কাছেই এক গর্তে আশ্রয় নিলাম।

আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছি সেই স্থান লক্ষ করে বৃষ্টির মতো বোমা নিক্ষেপ করলো ইহুদিসেনারা। আমি গর্ত থেকে বের হয়ে কাছেই

www.pathagar.com

আরেক গর্তে দ্রুত সরে গেলাম। দশ মিটার দূরের সেই গর্তে প্রবেশ করতেই প্রথম গর্তের ভিতরে বড় আকারের বোমা বিস্ফোরণ ঘটলো। বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠলো আশপাশ। আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়লো।

পনেরো মিনিট পর বোমা নিক্ষেপ বন্ধ হলো। নিরাপদে বেঁচে যাওয়ার কারণে আল্লাহর প্রশংসা করলাম। শান্তিরক্ষাবাহিনীর সদস্যদের একজন বললো, যায়নবাদীরা অভদ্র। ভীরু। নির্মম। কোনো দয়া-মায়া নেই তাদের।

সে দিন প্রথম গর্ত ছেড়ে দ্বিতীয় গর্তে কেনো গিয়েছিলাম তা আজও বুঝতে পারিনি। একটি অদৃশ্য হাত যেন আমাকে প্রথম থেকে দ্বিতীয় গর্তে টেনে নিয়েছে।

এ এক বড় রহস্য!

চার

বাগদাদ।

একজন লোক। ধার্মিক হিসেবে পরিচিত। সাবেক আইনমন্ত্রী। বিচারবিভাগের উচ্চপদে আসীন। দু'বছর পূর্বে তাঁর যুবক ছেলে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে। সে ছিলো তার বড়ছেলে। মানুষ তাকে সেই ছেলের নামের উপনামে ডাকতো।

সেই লোক এক রাতে গাড়ি চালাচ্ছিলো। 'সারাফিয়া' ব্রিজ পাড়ি দিয়ে রেলওয়ে অঞ্চলে গাড়ি চালাচ্ছিলো। রেলওয়ে রোডটি বিমানবন্দরের দিকে গিয়ে মিশেছে। এই পথে আছে রেলক্রসিং। লোকটির গাড়ি রেলক্রসিং-এর উপরে উঠলো। হঠাৎ ট্রেন এলো রেললাইনে। সংঘর্ষ যেনো না হয় তাই ক্রসিং পাড়ি দেবার ইচ্ছায় লোকটি দ্রুত চালালো প্রাইভেটকার। কিন্তু ক্রসিং-এর উপর গাড়ির গতি থেমে গেলো। নিশ্চিত সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে প্রাইভেটকার আর ট্রেনের মধ্যে।

সে সরবে উচ্চারণ করলো–

আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ।

www.pathagar.com

ট্রেন আঘাত করলো প্রাইভেটকারকে। দেড়শ গজ চলার পর ট্রেনচালক ট্রেনের গতি থামাতে সক্ষম হলো।

মানুষ দৌড়ে এলো গাড়ি ও গাড়িচালককে উদ্ধার করার জন্য। তারা এসে দেখলো চালক নিরাপদ। জীবিত। গাড়ির কাঁচ হালকা ভেঙ্গেছে শুধু। মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয়নি।

কীভাবে সম্ভব এটি? গাড়ির সামনে ও পেছনের দরজার কাঁচের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে রেলের বাম্পারের। ট্রেনের সামনের বাম্পার প্রাইভেটকারের কাঁচ ভেদ করে ঢুকে পড়েছে। গাড়িটি উপরে উঠিয়ে সামনের দিকে নিয়ে ট্রেনটি থেমে পড়েছে। বাম্পারে ঝুলন্ত ছিলো প্রাইভেটকার। গাড়িকে বাম্পারে ঝুলিয়ে দেড়শো মিটার চলেছে ট্রেন। ট্রেনের ড্রাইভার এরপর ট্রেন থামিয়েছে।

একজন লোক আমাকে বলেছেন, রেলক্রসিংয়ে গাড়িটি যদি আর এক আঙ্গুল অগ্রসর হতো বা সামান্য পরিমাণ পিছনে হটতো তাহলে ট্রেনের বিম গাড়ির লোহাতে আঘাত করতো। বিচূর্ণ হয়ে যেতো প্রাইভেটকার। হারিয়ে যেতো গাড়ির আরোহী ও চালক। খুবই সূক্ষ্মভাবে গাড়িটি সুঁইয়ের মতো রেলক্রেসিং-এ অবস্থান করছিলো। একটু আগে-পরে হলে সব ভেঙ্গেচুরে যেতো।

লোকটি বলেন, ট্রেন আমার গাড়িটাকে এমনভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে যেন যাত্রী নিরাপদে থাকে। কাঁচ ভেঙ্গে ভেদ করলো ট্রেনের বিম। এতে গাড়ির লোহার অংশে কোনো ক্ষতি হলো না।

মানুষ দেখতে এলো এই ঘটনা। লোকজন আমাকে গাড়ি থেকে নিরাপদে উদ্ধার করলো। আমাকে দাঁড় করালো। আমার হাত-পা ছুঁয়ে দেখলো তারা।

তারা বললো, আপনার কোনো আঘাত লাগেনি?

আমি বললাম, আল হামদুলিল্লাহ! আমাকে কোনো আঘাত স্পর্শ করেনি।

তারা বললো, এটি অসম্ভব!

লোকজন আমাকে পাশের হাসপাতালে নিয়ে গেলো। ডাক্তার আমার শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলো। প্রত্যেকেই হৃদয়ের গভীর থেকে

www.pathagar.com

উচ্চারণ করলো– আলহামদুলিল্লাহ। প্রশংসা সব আল্লাহর। আমি নিরাপদে আমার গাড়িতে করে বাসায় ফিরে এলাম। গাড়ির দরজার দু'টি কাঁচ ভেঙেছে শুধু।
ঘটনা শুনে মানুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করে।
এটিও কি সম্ভব?
এটিও কি ঘটেছে!
একজন বললেন, লা হারিসা কাল আজাল...!
ভাগ্যপ্রহরীর মতো কেউ নেই।

পাঁচ

আমি স্মরণ করলাম হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা। তিনি বীর ছিলেন। সাইফুল্লাহ! আল্লাহর তরবারি। কোনো যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেননি। শতাধিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। শরীরে আঘাত ও ক্ষতের চিহ্ন ছিলো অনেক। কিন্তু তিনি নিরাপদ অবস্থায় নিজ শয্যায় ইন্তেকাল করেন। রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করেননি। ভাগ্যলিপির উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে 'সাহায্য' একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। প্রতিটি জিহাদ দুটি কল্যাণ বয়ে আনে।
এক– শাহাদাত।
দুই– আল্লাহর সাহায্য।

এই বিশ্বাস ও আস্থা মুসলিম উম্মাহর বিশ্বময় নেতৃত্বের উপাদান ছিলো। এই ঈমানই মুসলিমদেরকে বিশ্বনেতা বানিয়েছে। সেই বিশ্বাস থেকে কতো দূরে আজকের আরব জাহান।
তবুও কি আমরা মুসলিম?
হায় অতীতের গৌরব!!
হায়! অতীতে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের জয়ের গল্প।

www.pathagar.com

কৃষকহত্যার শাস্তি

এক

তিনজন কৃষক। তাদের সঙ্গে তাদের গবাদিপশু। সাথে কিছু মাল-সামানা। মুসেল ও আকরা শহরের বুক চিরে খাজার নদী। এই নদীর তীর দিয়ে যাত্রা করলো তিন কৃষক।

রাত হয়ে গেলো। নৈঃশব্দ। কৃষকদের পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষা করছিলো তাদের যথাসময়ে ঘরে ফেরার। তাদের বসবাস ছিলো পাহাড়ি এলাকায়। রাতের দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেলো তবুও তিন কৃষক ঘরে ফিরে এলো না।

রাতের আঁধার কেটে সূর্য উঁকি দিলো। পাখিদের কলরব। কর্মব্যস্ত মানুষের ছোটাছুটি। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লো দিগন্তে। কিন্তু তিন কৃষক ঘরে ফিরলো না।

পরিবারের সদস্যরা গ্রামের জনপ্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করলো। তিন কৃষক ঘরে না ফেরার কথা জানালো। জনপ্রতিনিধি দ্রুত বাহনে আরোহন করে আকরা শহরে গেলো। পুলিশকে পরিস্থিতির কথা জানালো। সশস্ত্র পুলিশের একটি দল অনুসন্ধানে বের হলো। আকরার খাজার নদীর পথ ধরে হেঁটে গেলো পুলিশ। নদীর তীরে হারানো তিন কৃষক সম্পর্কে গ্রামের জনগণের কাছে জানতে চাইলো। পুলিশ টানা পাঁচ ঘণ্টা অনুসন্ধান করলো। পথে এবং গ্রামেও কোনো সন্ধান পেলো না তাদের।

www.pathagar.com

হঠাৎ একটি পাহাড়ের পাদদেশে পুলিশ তিনটি লাশ খুঁজে পেলো। লাশগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে কোনো গবাদিপশু বা নগদ অর্থ নেই। পুলিশ তিনটি লাশ বহন করে এনে দাফন-কাফনের আয়োজন করার পদক্ষেপ নিলো।

কিছুদিন পর দুই সহোদর ভাইয়ের গোয়ালে নিহত তিন কৃষকের গবাদিপশুর অনুরূপ কয়েকটি পশু পাওয়া গেলো। সহোদর দুই ভাইকে দ্রুত গ্রেফতার করলো পুলিশ।

দুই

অভিযুক্ত দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছিলো। হত্যা, চুরি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের হোতা হিসেবে তাদের পরিচিতি ছিলো আগে থেকেই। সুষ্ঠু তদন্ত শেষে তাদেরকে আদালতে পাঠানো হলো। এই দুইজন তিন কৃষককে হত্যা করেছে তা অনুমান করা হলো। নিহতদের পশুগুলো দুই ভাইয়ের গোয়াল ঘরে পাওয়া হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার একটি প্রমাণ। পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন এলাকার অনেকেই তাদের অপকর্ম ও সন্ত্রাসী কাজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলো।

ছোটভাই স্বীকার করলো হত্যাঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা। বড়ভাই সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো। সে ঘটনাস্থলে ছিলো না। আদালতে বিচারকগণ হত্যার স্বীকারোক্তিদাতা ছোটভাই ও অস্বীকারকারী বড়ভাইয়ের কঠোর শাস্তি ঘোষণা করলো। দুই সহোদর এতো বেশি সন্ত্রাসী অপকর্মের সাথে জড়িত যে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো পথ খোলা ছিলো না তাদের সামনে।

ছোটভাই ঘটনা স্বীকার করে একাই শাস্তি নিতে ইচ্ছুক হলো। বড়ভাই অস্বীকার করলেও নানা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দিলো।

তিন

তিন কৃষক হত্যার ঘটনা আলোচিত হলো সবার মুখেমুখে। প্রচারিত হলো ঘরে ঘরে। নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ জন-নিরাপত্তার কথা ভেবে মৃত্যুদণ্ড

www.pathagar.com

দ্রুত বাস্তবায়নের চিন্তা করলো। জনমনে যেনো নিরাপত্তার প্রতি আস্থা ফিরে আসে তাই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের উদ্যোগ নিলো। তাদের এই শাস্তি কার্যকর করা হবে খোলা মাঠে।

জনগণ যেনো দৃষ্টান্তমূলক এই শাস্তি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। গণমাধ্যম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সংবাদ ব্যাপক প্রচার করলো। সংবাদপত্র, রেডিও- টেলিভিশনে শীর্ষ নিউজ করলো এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সংবাদকে।

শাস্তি সারাসরি দেখার জন্য নানা স্তরের জনতা মাঠে সমবেত হলো।

১৯৫২ সাল। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেল। মুসেল শহরে 'তাঁবু' তোরণের কাছে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করলো প্রশাসন। দাবানলের বেগে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। পরদিন সকালে ফাঁসি কার্যকর করার সময় নির্ধারিত হলো।

অন্যদের মতো আমিও শুনলাম প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার খবর। এই জঘন্য অপরাধ আমার মনে রেখাপাত করেছিলো। আমিও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় সামনে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা করলাম। নির্ধারিত স্থানে হাজির থাকার প্রস্তুতি নিলাম। সৈনিক-ক্লাবে রায় কার্যকর করার রাতে জাগ্রত থাকলাম আমি। আমার সাথে অন্যান্য সেনা অফিসার।

ওদিকে মুসেল প্রশাসন আমার কাছে একটি চিঠি পাঠালো। রাষ্ট্রীয় চিঠি। চিঠি পড়ে জানলাম, আমাকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে রায় কার্যকর করার সময় প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলা হয়েছে। এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হত্যাকারী দুই ভাইয়ের কাছে রায় শোনানোর দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

চার

জেলখানায় গেলাম। সেনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল, জেলার, ডাক্তার, পৌরসভার প্রতিনিধি, আদালতের প্রতিনিধি ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত সেখানে। দেখতে পেলাম মোটা ফাইল। লাল, সাদা ও হলুদ রঙের ফাইল। রায় কার্যকর করার পূর্বে যথা নিয়মে প্রশাসনের নানা বিভাগের দায়িত্বশীলগণ প্রস্তুত। মৃত্যুর আগে অপরাধীকে তওবা ও

www.pathagar.com

কালেমা পড়ানোর জন্য একজন ধার্মিক লোকও উপস্থিত। প্রস্তুত জল্লাদ। দর্শক দেশের নানা স্তরের জনতা। জেলপ্রহরী খুললো জেলের ফটক। টগবগে দুই যুবক। সুদর্শন। সুঠামদেহী।

আমরা প্রবেশ করলাম তাদের কক্ষে। তারা হাসি মুখে এমনভাবে আমাদের স্বাগত জানালো। মনে হলো এটি তাদের বাসা আর আমরা তাদের অতিথি।

তারা নীরব। উৎফুল্ল। নির্ভীক। বিনয়ী।

আমরা তাদের দু'জনের সামনে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশটি পড়তে হিমশিম খেলাম তাদের স্বাভাবিক আচরণ দেখে। তাদের সহজ স্বাভাবিকতা দেখে মৃত্যুদন্ডের রায়টি তাদের সামনে পড়ে শোনাতে আমার দ্বিধাবোধ হতে লাগলো।

অবশেষে রায় কার্যকর করার বিষয়টি তাদেরকে পড়ে শোনালাম। পরদিন সকালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। তবে ফটকের কাছে খোলা মাঠে ফাঁসি কার্যকর করা হবে। তারা বীরোচিত ভঙ্গিতে রায় শুনলো। নির্ভয়ে।

ফাঁসির আসামীর শেষ ইচ্ছা পূরণের রীতি অনুযায়ী আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, জীবনের শেষ ইচ্ছা কী?

তোমরা কি কিছু বলবে?

পাঁচ

জীবনের শেষ কোনো ইচ্ছা নেই তাদের।

তারা বললো, এক কাপ চা এবং এক প্যাকেট সিগারেট হলেই চলবে।

তারা বললো, আল্লাহর দরবারে দয়া ও ক্ষমা চাই। মানুষের কোনো কিছু প্রত্যাশা নেই আমাদের। তারা একে অন্যকে সাহস দিলো অট্টহাসি দিয়ে।

ছোটভাই বড়ভাইকে বললো, হত্যা আমি করেছি। শাস্তি হবে আমার। আপনি নিরপরাধ। আপনাকেও শাস্তি দেওয়া হলো। আপনার উপর ফাঁসির রায় অবিচার হলো।

www.pathagar.com

বড়ভাই বললো, তুমি চিন্তা করো না। এটা ঠিক আমি তোমার সাথে হত্যায় জড়িত নই। কিন্তু আমি নিরাপরাধ অনেক মানুষকে হত্যা করেছি। আজ আমি সেসবের ঋণ পরিশোধ করছি।
ছোটভাই উপস্থিত লোকজনের কাছে পূর্ণ ঘটনা বললো।

সে যা বললো–
আমি আজ আল্লাহর রহমতের কাছাকাছি। আগামীকাল আল্লাহর মেহমান হবো। আমার বড়ভাই তিন কৃষক হত্যায় জড়িত নয়। সে সেখানে ছিলো না। আমি একাই ছিলাম। আমার হাতে ছিলো গুলিভরা বন্দুক।
আমি পথের ধারে ছিলাম। গবাদিপশু ও টাকা-পয়সাসহ তিন কৃষককে পথে দেখলাম। শিকার হাতছাড়া করতে চাইলাম না। একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম।
আমি তাদেরকে দেখছিলাম কিন্তু তারা আমাকে দেখতে পায়নি। বন্দুক থেকে একজনের মাথায় গুলি ছুঁড়লাম। তৎক্ষনাৎ লুটিয়ে পড়লো সে। প্রাণবায়ু উড়ে গেলো। দু'জন দৌড় দিলো। আবার তাক করলাম বন্দুক। গুলি ছুঁড়ে দ্বিতীয়জনকে ধরাশায়ী করলাম। তৃতীয়জনকেও গুলিতে ওপারে পাঠালাম।
হত্যার পর তাদের পকেট থেকে টাকা-কড়ি ছিনিয়ে নিলাম। গবাদিপশুগুলো হাঁকিয়ে পাশের পাহাড়ে নিয়ে গেলাম। রশি দিয়ে বেঁধে রাখলাম গবাদিপশু। ফিরে এসে তিন কৃষকের লাশ পথের পাশে খাদে নিক্ষেপ করলাম। শুকনো ঘাস ও কাঠ জড়ো করে লাশের উপর রেখে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। ছাই হলো লাশ। কেউ যেনো কোনো আলামতও না খুঁজে পায় এই জন্য লাশগুলো দগ্ধ ও ভস্ম করি। যেখানে লাশগুলো জ্বালিয়েছি আশেপাশে কোনো মানুষ ছিলো না।
পাশের গ্রাম ছিলো হত্যার জায়গা থেকে তিন মাইল দূরে। কৃষক হত্যা করে তাদের গবাদিপশুগুলো নিয়ে নিরাপদে আমার গ্রামে চলে আসি। বড়ভাইকে ঘটনা জানাই। সে দ্রুত গবাদিপশুগুলো নিয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে রাখলো। পুলিশবাহিনীর লোকজন হত্যার ঘটনা জেনে খোঁজখুঁজি করেও কোনো চিহ্ন পেলো না। আমরা পুলিশকে ফাঁকি দিলেও ভাগ্যের যিনি অধিপতি সেই আল্লাহ সব কিছুই জানলেন।

www.pathagar.com

একদিন আমরা এক ঝর্ণার কছে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ পুলিশ আমাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় গ্রেফতার করে। যদি আমরা জাগ্রত থাকতাম পুলিশের শক্তি ছিলো না আমাদের ধরার। আমরা দ্রুত পলায়ন করতাম। অন্য কোনো শক্তিও আমাদের ধরতে সক্ষম হতো না যদি জাগ্রত থাকতাম। আদালতে লোকজন গুলির শব্দ শোনার সাক্ষ্য দিয়েছে। আমার গ্রামের লোকজনও সাক্ষ্য দিয়েছে হত্যার রাতে আমাদের গ্রামে আমরা ছিলাম না।

আদালত রায় দিয়েছে- আমরা দুই ভাই কৃষক হত্যা করেছি। আমি অপরাধ স্বীকার করেছি কিন্তু আমার বড়ভাই কৃষকহত্যায় জড়িত ছিলো না। কিন্তু আদালত মনে করেছে বড়ভাইকে বাঁচানোর জন্য শুধু আমি হত্যার ঘটনা স্বীকার করছি। আদালত জানে না, আমার স্বীকারও সত্য। সত্য বড়ভাইয়ের অস্বীকারও।

বড় ভাই দাঁড়িয়ে বললো-

আমার সহোদর ভাই যা বলেছে সত্য বলেছে। আমি যতোই অস্বীকার করি আমার এই কথার কোনো মূল্য নেই এখন। আমি এই তিন কৃষককে হত্যা না করলেও অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছি। হত্যা করে শোক প্রকাশ করেছি। জানাজাতেও উপস্থিত হয়েছি। পরিবারের সাথে শোক প্রকাশ করেছি।

আল্লাহ আমার অনেক ঘটনা লুকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ সুযোগ দেন, কিন্তু সময় মতো সুবিচার করেন। আগামীকাল আমি ফাঁসির দড়িতে ঝুলবো। এই ফাঁসি তিন কৃষক হত্যার শাস্তি নয়। এই শাস্তি নিরীহ লোক হত্যার বদলা। মানুষের শাস্তি থেকে সাময়িক রক্ষা পেলেও আল্লাহর শাস্তি যথাসময়ে অবধারিত। আল্লাহর শাস্তি থেকে পালিয়ে কারো রক্ষা নেই। কোনো পথ নেই পালানোর।

ছয়

ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত। আদালতের রায় কার্যকর করা হবে। এই দৃশ্য দেখার জন্য জনতার উপচে পড়া আগ্রহ। তিন কৃষক হত্যার অপরাধীর শাস্তি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে প্রকাশ্যে। জনতার সম্মুখে।

www.pathagar.com

সহোদর দুই ভাই শান্তভাবে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলো ফাঁসির মঞ্চে। মঞ্চে যাবার আগে বুকে বুক মিলালো। ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। তারা দু'জনে শেষ মন্তব্য করলো।

ছোটভাই বললো– ভাই, আমাকে ক্ষমা করো।

বড়ভাই জবাব দিলো– তুমি তো আমাকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছো। আমি প্রকৃতই অপরাধী। অনেক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছি।

জনতা দেখছে। জল্লাদ ফাঁসির আনুষ্ঠানিকতা শুরু করলো। মাথা কালো কাপড়ে ঢেকে দিলো। দুই ভাই দুই রশিতে ঝুলে থাকলো। কৃষকহত্যার বিচার দেখলো জনতা।

কিছুক্ষণ পর নিথর হয়ে গেলো দুটি দেহ। ফাঁসির লাশ। কারো কোনো দুঃখ নেই। শোক প্রকাশ নেই। সন্ত্রাসী ও ছিনতাইকারীর ফাঁসি। নারী-পুরুষ গ্রামীণ-শহুরে সবাই দেখলো এ দৃশ্য। কারো কোনো দুঃখবোধ নেই সামান্যও। ঘৃণা প্রকাশও নেই।

কিন্তু একজন বৃদ্ধা অশ্রুপাত করলো। অঝোর ধারায় প্রবাহিত করলো অশ্রু। ঝুলন্ত লাশের পাশে কাঁদছে অপরাধীদেরন অপরাধীর মা।

পুত্রহারা মা বললেন–

দুঃখ ছাড়া আমার কিছুই করার নেই। এই দু'জন আমার হৃদয়ের টুকরো। আমি অপরাধজগত থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তারা আমার কোনো উপদেশ মানতো না। আমি তাদেরকে বহুবার বলেছি, সন্ত্রাস করো না, মানুষ হত্যা থেকে ফিরে এসো। ছিনতাই থেকে দূরে থাকো।

আমার কোনো কথাই তারা মানেনি। আমি ভেবেছিলাম, অন্যের গুলির আঘাত বা ফাঁসিতে তাদের মৃত্যু হবে। তবে আমি তাদের কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম, তারা যেনো আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে শহিদ হয়। তারা যেনো মুসলমানদের কোনো সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়। আমি কামনা করতাম, তারা যেনো ফিলিস্তিনে আল আকসা উদ্ধারের জিহাদে শহিদ হয়। তখন আমি হতাম শহিদের মা। গর্বিত মা। তখন আমার মাথা উঁচু থাকতো।

www.pathagar.com

আমি তাদেরকে বহুবার বলেছি, প্রত্যেক ঘটনার অবসান আছে। প্রত্যেকের শেষ একটি ঠিকানা আছে। মৃত্যু মানুষের ইহকালীন শেষ অধ্যায়। আমার কোনো কথাই শোনেনি তারা।

কোথায় শহিদি মৃত্যু? কতো জঘন্য মৃত্যু হত্যার বিচারে ফাঁসির রশিতে ঝুলে থাকা। শহিদি মৃত্যু গৌরবের। সম্মানের। মর্যাদার। হত্যার বিচারে কতো অপমানের মৃত্যু!

আমি বলতাম হত্যাকারীর পরিণাম হত্যা। আজ স্বচক্ষে দেখলাম তাদের পরিণাম। অপমানজনক অধ্যায়। এই ফাঁসি অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত। শিক্ষণীয়।

বিষণ্ন মনে অশ্রুসিক্ত চোখে বুড়ো মা বাড়ির পথে হাঁটলেন একাকী।

হৃদয়ের দরোজা যাদের খোলা তারা উপদেশ ও শিক্ষা নেবে এই কৃষক হত্যার বিচার থেকে। এই ফাঁসির রায় থেকে। হৃদয়ের জানালা কি মুক্ত না অবরুদ্ধ?

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবপ্রকাশ

শুধু বই নয়...

www.pathagar.com

লাবীব আব্দুল্লাহ

জামালপুর জেলায় পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন ১৯৭৪ সালে। মুন্সিবাড়ীর দুরন্ত ছেলেটি পারিবারিক নিয়ম ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মকতব মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। পিতা আব্দুল গনী (মরহুম)। মায়ের নাম মুহতারামা আমিনা।

১৯৯২ সালে ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী দীনি প্রতিষ্ঠান জামিয়া আরাবিয়া মাখযানুল উলুম ময়মনসিংহ থেকে দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন। কর্মজীবন শুরু এই মাদ্রাসায়। ২০১১ সালে তিনি যোগ দেন ঢাকায় অবস্থিত সেন্টার ফর ইসলামিক নলেজ এন্ড থট-এ গবেষণা কাজে। শিক্ষা নিয়ে তিন বছর গবেষণা করেন তিনি। মিফতাহুল জান্নাত মহিলা মাদ্রাসা গলগণ্ডায় তিনি চৌদ্দ বছর শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নারী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখেন। তিনি মাদ্রাসাতুস সুফফা, মাদ্রাসা ইবনে খালদুন ময়মনসিংহের প্রতিষ্ঠাতা। যৌথভাবে ইকরা ইসলামী একাডেমী নামে ২০০১ সালে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ময়মনসিংহে। ২০০০ সালে যৌথভাবে কার্যক্রম শুরু করেন শিকড় সাহিত্য মাহফিল নামে একটি সাহিত্য সংগঠন।

২০০৫ সাল থেকে ইত্তেফাকুল উলামা বৃহত্তর ময়মনসিংহের শিক্ষা সম্পাদক। লেখালেখি শুরু ছাত্রজীবনে। প্রথমে দৈনিক ইনকিলাবের সোনালী আসরে। মাসিক রহমানী পয়গাম, মাসিক আদর্শ নারী, কাবার পথে, দৈনিক আমার দেশ ও সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানে তিনি লিখতেন নিয়মিত। ২০০৫ সালে মাসিক রাহমানী পয়গাম লেখক সম্মাননা পান। মাসিক আদর্শ নারীর লেখক সম্মাননাও লাভ করেন তিনি।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। শিক্ষা কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে তিনি সউদি আরব, দুবাই ও লিবিয়া সফর করেন। বর্তমানে মাদ্রাসা ইবনে খালদুন ময়মনসিংহের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। সুফফা ইসলামিক ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহের শিক্ষা পরিচালক। একাধিক শিক্ষা ও সাহিত্য সংগঠনের উপদেষ্টা।

চার সন্তানের জনক লাবীব আব্দুল্লাহ লেখালেখিতে সরব। ইসলাম প্রচারে তিনি বহুমুখী কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরে বসবাস করেন।